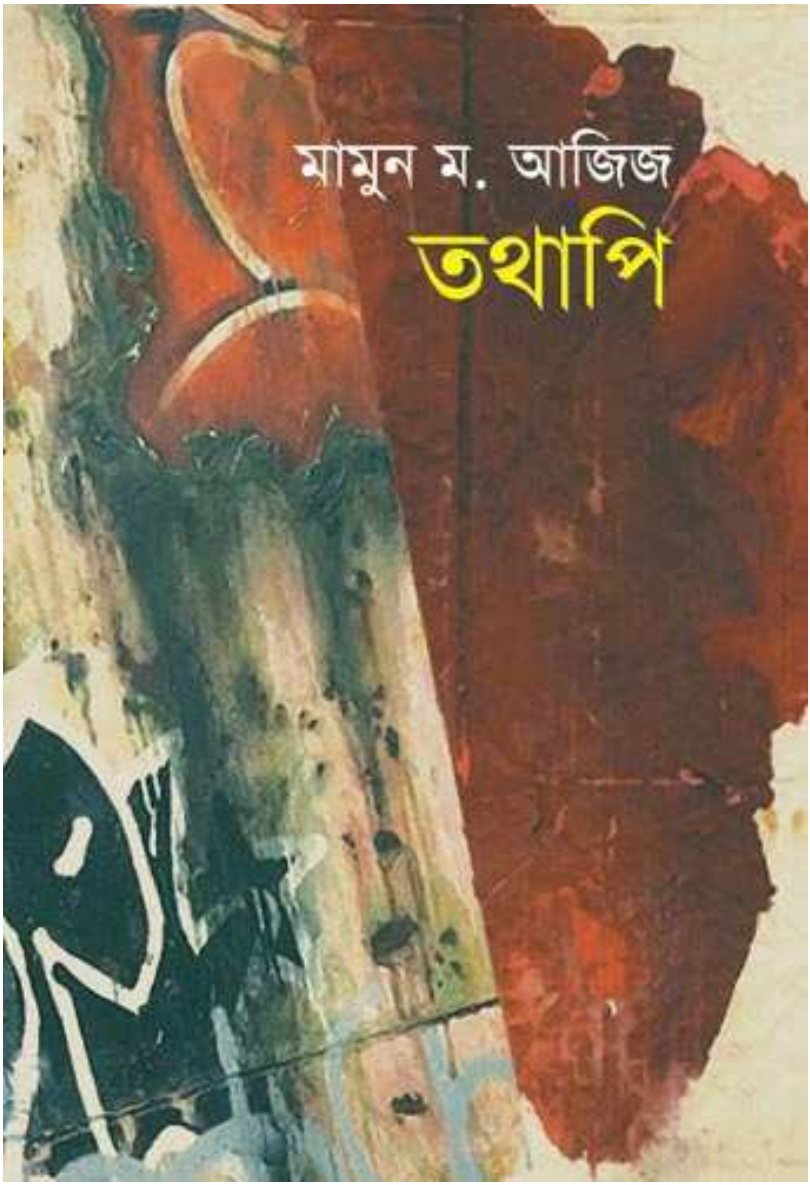
মামুন ম. আজিজ
তথাপি

মামুন ম. আজিজ

ত থা পি

জাগৃতি প্রকাশনী

মামুন ম. আজিজ // তথাপি

প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রকাশক	:	ফয়সল আরেফিন দীপন জাগৃতি প্রকাশনী ৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট নীচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
কার্যালয়	:	৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট ২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ	:	আহমেদ ফারুক
মুদ্রণ	:	দি ঢাকা প্রিন্টার্স পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা
মূল্য	:	**একশত চল্লিশ টাকা**
ISBN	:	984 70087 0076 8

উ ৎ স র্গ

যতসামান্য লিখতে
অগোচরে অনুপ্রেরণা জাগায়
প্রিয় যে ক'জনা
তাদের অন্যতম, আঁখি কে

তথাপি অবিরত বয়ে চলে বাতাস-
সেখানে ভুল অতীতের বারবিকিউ,
ভেসে আসে পোড়া ভুলের মউ মউ গন্ধ।

তথাপি নেমে আসে কখনও বৃষ্টির ধারা,
সেখানে জলের ছোঁয়ায় কষ্টের শ্যাওলা
সজীবতায় নিয়ত সুখের সাথে করে দ্বন্দ্ব।

তথাপি প্রতিটি প্রত্যুষ শেষে উজ্জ্বল রোদ,
সেখানে আলোয় দিগন্ত ধেয়ে দৌড়ে দেখি
অবিচ্ছিন্ন শান্তির দোর চিরতরে বন্ধ।

তথাপি ঘটনায় ঘটনায় জীবনে বৈচিত্র্য প্রতুল
সেখানে কাহিনীতে টুইস্টের নিরন্তর খেলা,
অবুঝ দর্শক আমরা তাই পুনঃ পুনঃ অন্ধ।

তথাপি সময় স্ব গতিতেই দৌড়াতে থাকে
সেখানে প্রতিরোধ গড়ার শক্তি কার?
নিকটে যে সবার নিশ্চিত মৃত্যুরই গন্ধ।

গল্প সূচী

পুনরাবৃত্তি /৭
সিজোফ্রেনিক/১০
তার অভিমান এবং তার মৃত্যু/১৮
বিবশ চোখের জল/২৫
বিশেষ ক্ষমতা/৪১
খ্যাতি প্রক্রিয়ার উপাখ্যান/৫২
শ্রাবনধারায়/৬২
মইসা ধরা মন/৬৮
এই না হলে মানুষ/৭৪
আড়ালেও কত বাস্তবতা/৭৮
হাজারদুয়ারীর স্বপ্ন পেরিয়ে/৮২
তথাপি/৮৭
ছোট ছোট বৃত্তের পরিধি/৯৩

পু ন রা বৃ ত্তি

কথাটা শোনার পর পুলকের মাথায় আকাশ ভেঙে পরার কথা ছিল। হয়তো পড়তোও । কিন্তু এই মুহূর্তে অতটা হুস জ্ঞান তার মধ্যে ছিলনা যাতে ভেঙে পড়া আকাশের ভারে জীবন্ত লাশ হয়ে অনঢ় শিকড় গাড়তে পারে ভূমিতে। তবুও বুকটা কেঁপে উঠেছিল ঠিকই।

নেশার আসরে যখন মাতাল হবার চূড়ান্ত পায়তারা চলছিল, বাবার ফোনটা এল তখনই। বাবার কণ্ঠে ছিল তেমনই কান্না ঝরানো বেদনা। সেই মাতাল মাতাল অবস্থাতাতেই তাই উঠে হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছিল হাসপাতালের দিকে।

পুলক যখন হাসপাতালে পৌঁছালো ওর মা'র ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডাক্তাররা বাইপাস অপারেশনের জন্যে রেডি হচ্ছিলেন।

পুলকের জন্যে ভীষন অস্থির তখন তার মা। ভাবছিলেন. এটাই উপযুক্ত সময়। আজই তাকে বলতে হবে, অবশ্যই বলতে হবে। সেই মহাসত্য পুলকের জানা উচিৎ। যদি অপারেশন সাকসেফুল না হয়, তাহলে আর বলাই হবেনা। না, বলতেই হবে, ছেলের কাছে যতই ছোট হতে হয় তবুও। এছাড়া উপায় নেই। এক সত্য নিশ্চয় তার ছেলেকে আরেক সত্যের মাঝে এনে হাজির করবেই; ফেরাবে তাকে আঁধার জগতের ঘন ছায়া হতে ।

ভাবছিলেন আর মনে মনে বড় ব্যাকুল হচ্ছিলেন তিনি। স্বামী ব্যাক্তিটি তার পাশে বসে ডান হাতটা ধরে রেখেছিলেন হাতের মুঠোয়। অঝোরে পানির যে ধারা ঝরছিল তার চোখে তাতে স্পষ্ট হচ্ছিল তার গভীর থেকে গভীরতর ভালোবাসা এই নারীটির প্রতি।

টলতে টলতে পুলক ঢুকেছিল। সে দৃশ্যে জোড়াজুড়ি করে থাকা হাতদুখানি কেঁপে উঠেছিল। স্বামী ব্যক্তিটি নিচুস্বরে বললেন, 'আমি পারলাম না পারুল, আমি পারলাম না।' পুলকের মা স্বামীকে ইশারায় বাইরে যেতে বললেন। উপস্থিত নার্সটিকেও। পুলক পাশে এসে বসতেই মদের উটকো কটু গন্ধ মার নাকে যন্ত্রনা দিচ্ছিল এবং তাতে তার আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল - এটাই উপযুক্ত সময়।

ছলছল চোখে মা'র দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে শুনেছিল মা'র সেই কথাগুলো যা শুনলে অন্য সময় অন্য কোন স্থানে তার মাথায় নিশ্চিত আকাশ ভেঙে পড়ত অথবা সেই ভেঙে ফেলত একটা দু'টো আকাশ নিমিষে।

ডাক্তার খবর পাঠিয়েছিল । বলার পর্ব শেষ হলেও মা আরেকটু উপসংহার টানছিলেন। পুলক তখন মা'র দুটো পা জড়িয়ে চেষ্টা করছিল কাঁদার। ওটিতে নিয়ে যাওয়া হলো পুলকের মাকে। চোখের ঈশারায় মার শেষ নির্দেশটা বুঝতে কষ্ট হলোনা পুলকের। পরক্ষণেই পুলক বাবার অসহায় আর নোনা জলে ভেজা মুখটির দিকে তাকিয়ে প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করল। একই সাথে ঐ লোকটার জন্য সে অনুভব করলো প্রচন্ড এক ভালো লাগার অনুভূতিও।

বাবা পরিচয়ের ঐ লোকটির সামনে ওখানে দাঁড়াতে পারলনা। মাতাল ভাবটা একটু কমে আসছিল। দৌড়ে হাসপাতালের করিডরে গিয়ে নিরিবিলিতে দাঁড়ালো একা একা। মনে তখন তার প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে বিশাল আকারে ঢেউ আছড়ে পড়ছিল অনবরত। একি শুনল হঠাৎ আজ মায়ের মুখে, ঐ লোকটা তার বাবা নয় । মানুষ হয়েও সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বের একজন, যেন একজন সাক্ষাৎ ফেরেস্তা। ঘুনাক্ষরেও তো কখনও বুঝতে দেননি। তবে কেনো আজ বললেন মা ? না জানলেই কি হতো না ? এতো বছর তো না জেনেই ছিল। সেই ছিল ভালো। অস্তিত্বহীনতায় ভোগার পরবর্তী সময়ে যে নেশার ডাক শোনার কথা ছিল সে ডাক তো সুখের পরশে অনেক আগেই শুনে ফেলেছে, সে নেশার রাজ্যও তো তার পুরাতন সঙ্গী। এত কষ্টের চাপ এখন কার আড়ালে লুকিয়ে ঠোকাবে সে? কোন নেশায় ডুবে?

একটিবার যদি বলতে পারত এই বাবা নামরে লোকটিকে - কেনো, কেনো তুমি মানুষ নও, কেন তুমি ফেরেস্তা, কেনো? মা নিষেধ করেছেন। মা বলেছেন এই কষ্টটা দেয়ার পাপটুকু না করাটাই ওনার প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। পুলক না জানুক - উনি তেমনই চেয়েছেন সব সময়। তবে মা কেন তাকে বলতে গেলো। এখন যে মনে মনে আরেকজন মানুষ কে, একজন শত্রুকে খুঁজে পাবার তাড়না প্রচন্ড, সে তার জন্মদাতা পিতা ।

মুহূর্তে হালকা হ্যাঙ্গ ওভারে থাকা পুলক বুঝে ফেলেছিল, মা'র এই ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা তাকে ফেরানোর।

ঐ যে ফেরেস্তার মতো লোকটা, যাকে বাবা বলে চিনেছে এতকাল, তার আজকের নব পরিচয়ের দূরত্বটাই তাকে বুক পেতে ফেরাতে চাইছে সকল আঁধার পথ থেকে। কষ্টে পুলকের বুক ফেটে যাচ্ছিল। আঁধার ছায়া তাকে গিলে ফেলেছে অনেকদূর পর্যন্ত। আসলেই কি সেখান থেকে মুক্তি এত সহজে হবে? না হলে এই ফেরেস্তার মতো লোকটির ত্যাগ, আদর্শ সব হবে বৃথা। না, পুলক ভেবে নিল এটাই একমাত্র উপায়। ফিরতে হবেই।

দেরী করল না, মুহূর্তে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে কল করল প্রেরণা নামের মেয়েটিকে। এ মেয়েটাই হতে পারবে তার এই মুহূর্তের প্রকৃত প্রেরণা। এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে মেয়েটার প্রতি তার চরম অপমান। বুঝতে পারে মেয়েটার চরম

বেদনা আর কষ্ট। চোখে ভাসে মেয়েটার সেই নির্ভেজাল চোখের কান্না। সাথে সাথে দেখে ফেলে যেন দূর ভবিষ্যত।

পরশু প্রেরণার বিয়ে, খবরটাও সে ঠিকই পেয়েছিল। মন চিৎকার করে উঠল , না না...।

ফোন ধরল অন্য একটা মেয়ে ।

'ও! দুলাভাই, আজকেও...'বলেই ফোনটা প্রেরণার হাতে ধরিয়ে দিল।

কণ্ঠ একটু একটু কাঁপছিল পুলকের। হলুদের মন্ডপে বসার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল প্রেরণা, ঘরের কোনে গিয়ে ফোন কানে লাগিয়ে বলল,

'হ্যালো, কে?'

'কেমন আছো প্রেরণা?'

সে কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা হলেও প্রেরণার চিনতে একটুও কষ্ট হলোনা। হওয়ারও কথানা। কিন্তু চিনেই বলে উঠল,

' ফোন করেছ কেনো? বিয়ের কার্ড পাওনি। লজ্জা করলোনা । হলুদে নুনের ছিটা দিতে ফোন করেছ।'

' না প্রেরণা শোন, তোমাকে আমিই বিয়ে করব। আমিই..'

'ফোন রাখ, আর কত মাতলামী করবে, কত বোতল গিলেছ আজ? ছিঃ, ছিঃ, দয়া করে আমাকে আর ফোন দেবেন না মিঃ পুলক, যদি না শোনেন এই নম্বর আমি বদলে ফেলব।'

'না, আমি ...আমি সত্যি বলছি। আমি ভুল করেছি। তোমাকেই বিয়ে করতে হবে, হ্যাঁ তোমাকেই আমার প্রয়োজন , ভীষন প্রয়োজন।'

'বাহ্! তোমার হাতের পুতুল, যখন ইচ্ছে খেলবে, যখন ইচ্ছে ছুড়ে ফেলবে, আবার তুলবে আবার ফেলবে, কি পেয়েছ তুমি, কি ভাব নিজেকে?'

' প্রেরণা তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমার সন্তান তোমার পেটে। আমি স্বীকার করছি। ক্ষমা করে দাও। দাও একটা সুযোগ, একটা। '

'তুমি স্বীকার করলেও আমি করিনা। একটা লম্পট, মাতাল, প্রতারক, মিথ্যুক কখনই আমার সন্তানের বাবা হতে পারেনা, কখনই না।'

' তুমি অন্য একজন কে ঠকাবে...?'

'মোটেও না, সজলকে আমি সব জানিয়েই বিয়ে করছি। ইনফেক্ট ওই আমাকে অ্যাবরশনটা করতে দেয়নি। ও মানুষ না , ও একটা ফেরেস্তা। ...

প্রচন্ড ভুমিকম্প পুলকের মনে। চোখ দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার মতো অবিরত ঝরতেই থাকলো পানি। অনাগত দিনের আরেক পুলকের জন্মাশংকায় কেঁপে উঠল দেহের সকল নার্ভ। ভাবল, তার প্রকৃত বাবাও নিশ্চয় তার মতোই কোন লম্পট ছিল, এ হীন পুরুষানুক্রম চলতে দেয়া যায়না।

সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল- 'না, আরেক পুলকের পুনরাবৃত্তি হতে পারেনা!'

সি জো ফ্রে নি ক

ঘরে তার শূণ্য পাওয়ারের একটা বাল্বও লাগানো আছে, লাল রঙের। অন্যগুলোর সাথে সেটাও আজ অফ করে রেখেছে নীল নামের তরুনটি যাতে পুরো ঘর জুড়ে নেমে আসতে পারে নি কষ কালো অন্ধকার।

অন্ধকার ঠিকই এসেছে নীলের ঘর জুড়ে, নিজের হাতদুটোও দেখার মত এক চিলতে আলো ছুটে আসেনা তার চোখে। আশেপাশের পৃথিবী মোটামুটি সবটুকু আলোকে ঘুমের কাছে সমার্পিত করে দিয়েছে। এটাতো ঘুমেরই সময়, অন্তত সাধারণ প্রতিটি মানুষের জন্যতো বটেই। খুব ভয়ে ভয়ে নীল চোখ দুটো বন্ধ করতে চেষ্টা করে, ভাবে হয়তো আজকে আর সেরকম হবেনা, হয়তো আজই তার প্রাণে মুক্তির নতুন সুর বেজে উঠবে। তারপরও চোখদুটো বন্ধ হয়না। সেই অজানা আশংকা যা গত সপ্তাহখানেক ধরে তাকে ভিন্ন এক জগতের মাঝে বন্দি করেছে আর রেখেছে অচেনা অবোধ্যতায়, সেই শংকায় নার্ভগুলোর উপর আধিপত্য খাটিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরে, খুলে রাখে।

একটু সময় নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে, 'কেনো এমন হচ্ছে, কেনো?'

কোন কূল কিনারা পায় না যেমন পায়নি আগেও। তারপর একসময় চোখবন্ধ করেই ফেলে ।

...তীব্র আলো ঘর জুড়ে, কান্নার আওয়াজ খুবই স্পষ্ট, মেয়েটা মাথা নিচু করে বসে আছে ঘরের এক কোনায় সেই প্রতিবারের মতই।

আজও ডাকল নীল, 'আই মেয়ে কাঁদছ কেনো, আই মেয়ে , এদিকে এস।'

মেয়েটা অন্যদিনের মতই মাথা নাড়ল শুধু...

আর তখনই চোখ দুটো খুলে যায় নীলের । কোথায় সে আলো, এ যে নিকষ কালো অন্ধকার।

একটু সময় নিয়ে আরেকবার আজ নীল সাহস করে চোখ বন্ধ করে। সেই আলোকিত ঘর, মেয়েটা কাঁদছে, মাথা নিচু করেই আছে সে। চোখ আর বন্ধ রাখতে পারেনা নীল। তারপর কেটে যায় নির্ঘুম রাত।

...এভাবেই কেটেছে গত ৭/৮ টি রাত তার। অসহ্য এক যন্ত্রনা। খোলা চোখেও কি আর শান্তি পাওয়া যায়, রাজ্যের ভাবনা সব চারপাশে ঘোরে ফেরে। অনেকটা সময় সে পার করে আসে বারন্দায় হাঁটাহাঁটি করে।

রাতের ঘুম আজকাল নীলের কাছে ভীষণরকম অচেনা। দিনের বেলাতেই যা একটু আধটু ঘুমিয়ে নেয়। দিনে অবশ্য চোখ বন্ধ করলে অস্বাভাবিক ঘটনার কিছুই ঘটেনা। ক্লাস ছুটি বলেই রক্ষে। কিন্তু এম.এস পরীক্ষার পড়া, সেতো ছিকেই উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কয়েকবার ভেবেছে ভাইয়া আর ভাবীকে বলবে এই সমস্যার কথা, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে বিষয়টা হাস্যকরই মনে হবে তাদের কাছে।

ভাবী গতকাল একবার অবশ্য জিজ্ঞেস করছিল কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা, না বোঝার তো কোন বিষয়ই নইে, একটু খেয়াল করলেই কেউ বুঝবে, কদিন আগের নীল আর আজকের নীলে বিস্তর তফাৎ, মন তার চোরাবালির মাঝে ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, প্রাণবন্ততা তার চেহারা হতে হারাচ্ছে ক্রমাগত।

আরও কয়েকটা রাত পরে...

মাঝে কয়েকদিন চোখ বন্ধ করার চেষ্টাই করেনি নীল। আজকে আর না বন্ধ করে পারলনা। কান্নার আওয়াজে কোন পরিবর্তন নেই। তবে পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটার অবস্থানের । আজ সে ঘরের কোনায় না, খাটের কিনারে বসে আছে। মাথা নিচু । নাহ! চোখ বন্ধ রাখতে পারলনা যদিও তার খুব ইচ্ছে হলো আজ আরেকটু দেখে নিতে। কিন্তু কোন অজানা কারনে সে চোখ খুলেই ফেলল, হয়তো কোন সংকায় এবং ভয়ে এবং জীবনের সবচেয়ে অবাক এই প্রথম হলো যখন সেই খোলা চোখেই সে স্পষ্ট শুনতে পেলো কান্নার সেই পরিচিত আওয়াজ। আবার চোখ বন্ধ করল। আজ একটা দফারফা সে করবেই। মেয়েটাকে জোড়ে ডাকল, চোখ তুলে তাকাতে বলল। মেয়েটার সেই একই অনুভূতি, মাথা নাড়াল কেবল। রাগ হলো ভীষণ নীল এর। চোখ মেলল, কান্নার আওয়াজই কেবল নয়, সারা ঘরের অন্ধকারও ফিরে এলোনা। কি আজব। মেয়েটাকেও সে স্পষ্ট দেখল সেই খোলা চোখেই। আর স্থির থাকা সম্ভব হলোনা। চিৎকার করে উঠল, 'আই মেয়ে সমস্যা কি তোমার?'

শোয়া থেকে উঠে মেয়েটার দিকে এগোলো একটু। আবার চিৎকার করে উঠল, মেয়েটা মাথা নাড়াচ্ছেই কেবল। আর পারলনা। হাত বাড়িয়ে মেয়েটার মুখটা উঁচু করে ধরল, মেয়েটা চোখ মেলে তাকাতেই অবাক তাকিয়ে রইল।

..দরজায় টোকা পড়ল ঠিক সেই মুহূর্তেই; তার ঘরের দরজা খোলাই থাকে।

টোকা দিয়ে অপেক্ষা করলনা ঘরে ঢুকেই পড়ল নীলের ভাবী আর ভাইয়া । লাইটের সুইচ চাপার শব্দ হলো। কিন্তু সেসব নীল শুনল বলে মনে হলোনা। বাস্তবতার থেকে অবাস্তবতাই তার কাছে যেন প্রগাঢ় সত্য এখন।

ভাবী এসে কাঁধ ঝাকিয়ে বললো , নীল কি হয়েছে, কি হয়েছে নীল?

কিন্তু নীল তখন মেয়েটার মুখ উচিয়ে ধরে চেহারা দেখে নিয়েছে। দেখেই মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বের হয়ে এল, 'আরে তুমি?'

ভাইয়া নীল কে ধরে বসিয়ে দিলেন বিছানার উপর, কিন্তু সেসব কিছুই যেন তার কাছে কোন ভাবান্তর ঘটাচ্ছে না। সে বলেই চলেছে - তুমি, তুমি এতদিন ধরে কাঁদছ, একবার মাথা তুলে তাকতে বললাম তাকলে না, কি , কেনো কাঁদছ, বল বল , আমাকে বল, ...

ভাবি এবার জোড়ে ধমক দিয়ে উঠলো, 'আই নীল, স্বপ্ন দেখছিস নাকি , স্বপ্ন...'

জোড়ে আরেকবার কাঁধ ঝাকালেন তিনি নীলের, ঠিক তারপর একবার ভাবীর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েই মূর্ছা গেলো নীল।

মূর্ছা যাবার কারনেই নতুবা হয়তো সেই ক্রন্দনরত মেয়েটিকে চিনতে পেরেই সেরাতে আর চোখ মেলে তাকাতে হয়নি নীলকে। বহুদিন পরে ঘুম তার জয় করেছে রাতের আহ্বান।

রাতে যখন জ্ঞান ফিরছিলনা, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলো নীলের ভাই আর ভাবী। নীল বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল আর তারা ছিল চরমতর অস্থিরতায়।

রাতের আঁধার আকাশের পিঠ চিরে দিবসের নীল সুর যখন প্রথম জেগে উঠল ঘন ভোরে তখন জ্ঞান ফিরে এল নীলের।

জ্ঞান ফিরেই ভাইয়া ভাবী কাছে এল যেই, জিজ্ঞাস করল, 'কি হয়েছিল রে নীল, কি হয়েছিল?'

'আমি চিনতে পেরেছি, আমি চিনতে পেরিছি ... দেখ তো ভাবী, কবে থেকে আসছে , বুঝতেই পারলাম না যে ...ওহ! ভাবী তোমাদের কে তো বলাই হয়নি ...'

এমন সময় ডাক্তার ঢুকলেন, ভাই ভাবীর আর শোনা হলোনা। ডাক্তার বললেন নীলের রেস্ট দরকার। তার ধারনা কোন কারনে নীল খুব বেশী আপসেট, ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পারিয়ে দেয়ার আয়োজনে মাতলেন ডাক্তার তাই।

ভাই ভাবী যতই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন, অসংলগ্ন কথাবার্তার মানে কি, মানসিক ভারসাম্য হীনতা ...

ডাক্তার থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'না এত সহজে মানুষ ভারসাম্য হারায়না। সম্ভবত কোন হঠাৎ ভয় বা কোন স্বপ্ন দেখে এমন হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপরও ডাক্তার শেষে একজন মানসিক রোগের ডাক্তারের অ্যাড্রেস দিয়ে বলেন একবার কনসাল্ট করে নিতে।

দেরী করলেন না তারা। সেই ঘুমান্ত নীলকে নিয়েই তারা ছুটলেন নরসিংদী। ওখানেই নীল এর বাবা আর মা থাকেন। তাদের স্থায়ী নিবাস। ঢাকার ব্যস্ত পরিবেশে বিশ্রাম হবে না ঠিক মতো। হয়তো ভাই ভাবী ঠিকই ভেবেছিলেন। কিন্তু সব ঠিক ভাবনা কি আর জীবনে ঠিক হয়ে ধরা দেয় ভবিষ্যত সময়ে?

নরসিংদী শহরের একটপ্রান্তে ওদের বাড়ীটা। দোতলা। বাড়ীর সাথে লাগোয়া একটা দীঘি আছে। দীঘিটা অবশ্য কারও একার সম্পত্তি নয়। আশেপাশের যে কটা বাড়ী আছে তারা সবাই এর অংশীদার এবং সে কারনেই বোধহয় দীঘিতে অনেকগুলো

ঘাট। বিকেল কাটানোর জন্য জায়গাটা অতি মনোরম এবং রোমান্টিক আবেশ সমৃদ্ধতো অবশ্যই।

সকাল ৮ টার আগেই নীল কে নিয়ে ভাই আর ভাবী বাড়ীতে পৌঁছে গেলেন। স্কুল মাস্টার বাবাকে আগেই ইনফর্ম করে দেয়া হয়েছিল। খুবই ব্যতিব্যস্ত হচ্ছিলেন তিনি এবং তার স্ত্রী মানে নীলের মাও। সবাই ধরাধরি করে নীলকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেলো। মা ঘুমন্ত নীলকে দেখেই খুব কাঁদতে শুরু করলেন। মায়ের মন অল্পতেই নড়ে ওঠে আর এ অবস্থায়তো আরও বেশী হবেই।

ভাই দিলো বকা, বলল, 'কিছু হয়নি ওর।'

যে টেক্সী ক্যাবে এসেছিলেন ঢাকা থেকে ওটাতেই ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন, ছুটি তো নেননি তারা কেউই । কিন্তু তা বললে কি আর মা বাবা যেতে দেন। অগত্যা তারাও থাকলেন। রাতে ঘুমাননি তেমন, ক্লান্ত তারাও। একটু ফ্রেশ হয়ে খেতে বসবেন সেই সময় নীলের ঘুম ভাঙল। ছোট বোন নীলা বসেছিল খাটের পাশে। নীল উঠেই খুব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করল নীলাকে , 'কিরে তুই !' তারপর চারপাশে তাকিয়ে সে চিনল ঠিকই, এ সে তার আপন ঘর; যে ঘরেছে কেটেছে তার ২৫ বছর জীবনের প্রায় ২০টি বছরই।

নীলা ঝুটে গেলো অন্যদের কাছে , তার পেছনে পেছনে নীলও।

অস্বাভাবিক ঘটনায় মানুষ যেমন চমকে ভাই ভাবী যেন তেমনই চমকাল হঠাৎ এত স্বাভাবিকতায়। তারপর মাকে বলল, 'এই দেখ মা বাড়ী ফিরেই আপনার ছেলের সব রোগ ঠিক। এবার বল তো কি হয়েছিল নীল?'

'কি হয়েছিল মানে। ওকে তোমরা নিয়ে আসনি, বাড়ী গেছে বোধহয় , তাই না? ঠিক আছে খুব খিদে পেয়েছে, খেয়ে পরে ডাকতে যাব। মুখ ধুয়ে আসি দাঁড়াও।'

ভাই ভাবী দুজন দুজনার মুখ চাওয়া চাওয়ী করল। বাবা মাও একটু অবাক। কেউ তবুও কিছু বুঝলনা। ভাবীই মুখ খুলল, 'না মাথায় সত্যি গন্ডগোল হয়েছে ওর। একটু সুস্থ হলেই ঢাকায় নিয়ে ঐ পাগলের ডাক্তারকে দেখাতেই হবে।'

মা আবার সাথে সাথে কেঁদে উঠলেন। 'পাগল! আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে বৌমা?'

'আরে না মা, পাগল না, মাথায় একটু...থাক ও আপনি বুঝবেনা।'

ভাই এটকু বলেই বাবার দিকে ফিরলো, বললো , 'বাবা ক'দিন আগে যখন বাড়ী এসেছিল , তখন কিছু ঘটেছিল নাকি?'

' না তাতো জানিনা, আর কি ঘটবে? তবে প্রতিদিন বিকালে ঘাটে গিয়ে বসে থাকত চুপচাপ, ঐযে ঐ আঁচলদের বাড়ীর ঘাটে।' 'সন্ধ্যার পরেও বসে থাকতে দেখেছি কদিন', মা বলে উঠলেন।

'কি অবস্থা এখন মা, আঁচলের মা'র। উনি কি সুস্থ হয়েছেন, মেনে নিতে পেরেছেন আঁচলের ঐ মৃত্যুটা?'

'তা কি আর পারে কেউ বৌমা, তবে সময় সব ভুলিয়ে দেয়, কি করবে, ভাগ্যের উপর কি কারও হাত আছে মা। এইতো আগামী শুক্রবারই আঁচলের বড় বোন, আলেয়ার বিয়ে । তোমাদেরও আসতে বলেছেতো। চলে এস। খুব খুশি হবে। ..'

বাবা মা , ভাই ভাবী আর ছোট বোন যখন খেতে খেতে রাজ্যেও গল্পে মেতেছে ঠিক সে সময় নীলের কথা সবাই যেন ভুলে গেছে। নীল তখন দোতলায় বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে বের হয়েছে। বাথরুমের পরেই একটু ছোট বারান্দার মত। এখানে দাঁড়ালে দীঘিটা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় আঁচলদের বাড়ীটা, বাড়ীর সামনে একটা অনেক বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ। সে গাছে রঙবেরঙের পাখী এসে বসছে। শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়ছে দীঘির পানিতে টুপটাপ।

সেদিকে অপলক তাকিয়ে থাকে নীল এবং তাকিয়েই থাকে। একটু উৎফুল হয় কারন ঐ তো সে দেখেতে পায় ছুটে আসছে আঁচল তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীঘির পার ঘেঁষে। নীল একটু আড়াল হয়। মনে মনে ভাবে, না অভিমান করবেই। ও না বলে বাড়ী চলে গেলো কেনো। ঢাকায় বাসায় গিয়ে সারা রাত, প্রতি রাত কাঁদতে পারে পাশে বসে, আর এখন একা ফেলে দীঘির পারে গেছে। অভিমান তো করবেই। লুকিয়ে থাকবে সে , খুঁজেই পাবেনা কেউ।

সত্যি সত্যি সে ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে লুকোয় । নীলা ছাড়া ঐ লুকানোর জায়গাটা কেউ চেনেনা।

নিচে খাওয়া দাওয়া যেই প্রায় শেষ তখন নীল এর খোঁজ হয়। কোথায় গেলো কোথায় গেলো বলে মাতম ওঠে। কিন্তু ওকে পাওয়াই যায়না। নীলা মনে করে ছাদে খুঁজতে ওঠে এবং সেই তার চেনা আড়ালটাতে গিয়ে পেয়ে যায়।

' ও চলে গেছে, নীলা? ও থাকলে কিন্তু আমি নিচে নামবো না খেতে।'

নীলা নীলের সে কথা শুনল কিনা জানিনা, সে তখন ডাকছে চিৎকার করে নিচের অন্যদের আর বলছে 'পেয়েছি ভাইয়াকে পেয়েছি।'

নিচে নেমে যখন সে দেখল আঁচল নেই , বসে খেয়ে নিলো নির্দ্বিধায়। তারপর গিয়ে বসল একা একা দীঘির ঘাটে। ভাইয়া ভাবী ঘুমাতে গেলেন। অনেক ধকল দেহে। নীলের আপনভূবনে ঘটে যাওয়া ছাদ আর লুকোচুরি কারও অস্থির মনে সাময়িক কোন ব্যতয় ঘটালো না। স্বাভাবিকতার স্বপ্ন বিভোর সবাই স্বাভাবিকতায় মেনে নিয়েছে ছাদে খুঁজে পাওয়ার ঘটনা।

দীঘির ঘাটে বসতেই নীল দেখল মোটা কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে আঁচল। দূর থেকেই বলল, 'কোথায় লুকিয়েছিলে।' বলতে বলেতেই তার টানা টানা চোখদুটো থেকে পানি ঝলকে পড়লো।

নীলের ইচ্ছে হলো আরেকটু কাঁদাবে, মুখ ঘুরিয়ে রাখল। ঠিক তখনই বলে উঠল আঁচল, 'ঠিক আছে কথা বলবানাতো, দাঁড়াও আমি দীঘিতেই ঝাঁপ দেবো।'

‘ ইস সাঁতার জানে... ’ না ঘুরেই বলল নীল।

‘তাহলে মরলাম কি করে?’ আঁচল এ কথা বলার সাথে সাথেই নীলের কানে এল পানিতে কিছু পড়ার শব্দ।

আঁচল বলে চিৎকার দিয়ে উঠল সে এবং সাথে সাথে লাফ দিল এ ঘাট থেকেই...

সে শব্দ কানে গেলো বাড়ীর সবার, সাথে সাথে আশেপাশের অনেকেরই। ছুটে এল ভাইয়া। লাফিয়ে পড়লেন।

আরেকটু দেরী হলেই কি হতো কে জানে। সাঁতার যে জানেনা নীল তা কিন্তু নয়। কিন্তু সে ডুবে যাচ্ছিল , সবাই তাতেই অবাক ভীষণ ।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের বাড়ীগুলোতে এ খবর। পাগল হয়ে গেছে নীল - এমনই খবরই চাউর হলো ।

কেউ কেউ বলল, ইস ছেলেটা শেষ পর্যন্ত আঁচলের জন্য পাগলই হয়ে গেলো।

পরিবারের লোকেরা ভাবছিলেন অন্য রক ভাবে, -এত দিন পরে কেনো? আঁচল মারা গেছে সেতো আরও বছর দেড়েক আগে।

নীলা বলল কেবল,‘ ছোট ভাইয়া তো আঁচল আপারে অনেক পছন্দ করত। আমি জানতাম। দুজনা কত কথা বলত ঐ ওপাশে দীঘির পরে ওই যে বিলের ধারে বসে বসে।’

সবাই যখন এসব কথা বলছিল তখন নীলকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং মুরুব্বী প্রতিবেশীদের কথা মত তার পায়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাও হয়েছিল।

আরও কয়েকটা দিন পরে...

সেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে ডাক্তারের সামনেই বসে আছেন নীলের ভাই আর বাবা। পাশের একটা কাঁচ ঘেরা গ্রীন হাউস মার্কা ঘরের খাটের উপর বসে আছে নীল, সে ক্রমাগত কারও সাথে কথা বলেই চলেছে। চেম্বারে বসা লোকগুলো অবশ্য দেখতে পাচ্ছেনা কার সাথে কথা বলছে ছেলেটি। সুস্থ মানুষের পক্ষে দেখার কথাই তো নয়।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের কাছে বলেছেন তারা দুজন যা ঘটেছে তাদের গোচরের আওতায় বিগত কদিন।

‘আচঁল মেয়েটা তাহলে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে’ বললেন ডাক্তার ।

বাবা বললেন, ‘ না , মেয়েটা কলেজ থেকে ফিরবার সময় রোড একসিড্যান্টে মারা গেছিল।’

‘তাহলে তো ঘটনা আরও জটিল, দুর্ঘটনাটাকেই সে নতুনভাবে নিজস্ব কল্পনায় নানান রূপে দেখার চেষ্টা করছে নিজের অজান্তেই। প্রথমবার দেখেছে পানিতে ডোবার

বিষয়, হয়তো এর মধ্যে আরও অনকে রকম কিছূ ঘটে থাকতেও পাত্ম, যেটা আমরা বা আপনারা জানেন না'

'হু, ঠিকই ডাক্তার সাহেব, ছেলেটা আমার এর মধ্যে একবার ছাদ থেকেও লাফ দিয়ে পড়বারও গেছিল, বলতাছিল আঁচল হাত দাও...'

'তাইতো বলছি খুব সাবধানে থাকতে হয় এই ধরনের রোগীদের কাছ থেকে, খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। খুব বেশী। '

' কিন্তু কি হয়েছে ডাক্তার সাহেব আসলে ওর?'

'রোগটা খুবই অন্যরকম, এই রোগে মানুষ তার আশেপাশের সবকিছূ ভুলে যেতে পারে, যা কেউ দেখছে না সে সেরকম একটি নিজস্ব ভূবন কল্পনায় দেখতে থাকে এবং সে ভূবনেই তার ক্রিয়াকর্ম চালাতে থাকে। কখনও তার হেলুচিলেশন হতে পারে মানে এমন কিছু দেখবে সে যার কোন আদৌ অস্তিত্বই নেই। কখনও তার হতে পারে ইলিউশন, সে দড়ি দেখে ভাববে সেটা একটা সাপ, বা কোন মেয়ের ছায়া দেখে, এমনকি কোন গাছের ছায়াকেও সে ভাবতে পারে সেটাই আঁচল, কখনও আবার ডিলিউশনও হতে পারে , অন্য কোন মেয়ের কণ্ঠ শুনে ভাববে কথা বলছে আঁচল । নানান কল্পনা এ রোগে, জটিল দেখেই এর চিকিৎসাও কঠিন , অনেক কঠিন...

'কারন কি ডাক্তার?' ভাইটি নীলের যেন কেঁদেই ফেললো।

'কারন জটিল , তবে ঐ যে সব মনোরোগের মতই বলতে হয়, মনের উপর বাড়তি চাপ আর নিসঃঙ্গ চিন্তার ভ্রান্তিই এ রোগের কারন এবং ঐ মেয়েটার প্রতি তার গভীর অকৃত্রিম ভালবাসা হারানোর ব্যাথা যা ভোলা তার সম্ভব হয়নি।'

ঠিক এ সময় পাশের কাচ ঘেরা ঘরে খাট থেকে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নীল। পকেট থেকে মোবাইল বার করে কল করতে থাকে আঁচলের নম্বরে, আঁচল ফোন ধরেনা। ধরবে কেমন করে, রিংই তো হয়না, যদিও সেটা বোঝনো নীল, সে কানে স্পষ্ট শোনে নো কানেকশন অ্যানাউসমেন্টকেই রিং হিসেবে।

যেদিন আঁচলের অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল সেদিন নরসিংদীতেই ছিল নীল। ঢাকা থেকে গিয়েছিল আগের রাতে। কলেজ থেকে আঁচল তার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছিল। মোবাইলে সেরকম কথাই হয়েছিল অ্যাকসিডেন্টের খানিক আগে। তারপর আর রিং হয়নি। ট্রাকটা আঁচলের রিকশাটাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছিল, মোবাইল ছিটকে গিয়েছিল হাত থেকে । অনেকক্ষণ নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষার পরেও যখন আঁচল আসেনি, বারবার ফোন দিয়েছিল কিন্তু ফোন তো ততক্ষণে আঁচলের প্রাণ বায়ুর সাথেই মরে গেছে চিরতরে। প্রচন্ড রাগ মাথায় নিয়ে চলে এসেছিল বাড়ীতে, দীঘির পাড়ে ঘাটে ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিল আঁচলের লাশটিও।

সেসব কি আর এই সিজোফ্রেনিক ডিসওরডারে আক্রান্ত রোগীটির মনে পড়ে। সে রাগান্বিত হয় আঁচল ফোন না ধরায়। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ এই সাত তলার উপর থেকে নিচে পিচঢালা রাস্তায় চোখ যায়। দেখে আঁচল রিকশায় বসে যাচ্ছে।

আবার রিং করে, ফোন ধরেইনা আঁচল। হতভম্ব হয়ে যায় ক্ষণিক নীল যখন দেখে একটা বাস আঁচলের রিকশার দিকে পেছন থেকে ধেঁয়ে আসছে প্রচন্ড গতিতে, আরেকটু হলেই ধাক্কা দেবে দেবে, চিৎকার করে ওঠে নীল আঁচলের নাম ধরে, কল করে মোবাইলে বারবার, ধরেনা আঁচল, রেগে যায় নীল, মোবাইল সেট দিয়েই বাড়ী মারে বন্ধ জানালার কাচে, প্রথমবারে ভাঙে না, আবার মারে। এবার ভেঙে যায় জানালার কাচ...হাতের কব্জির অনেকটাই কেটে যায় ভাঙা কাচের আঘাতে, সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। সে চিৎকার করে ডাকছেই , 'আঁচল, আঁচল...'।

কাচ ভাঙার আওয়াজ কানে যায় পাশের ঘরে ক'জনার। ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষনে হাতের কব্জি বেয়ে গড়গড় করে রক্তের ধারা নামছে। বাবা চিৎকার করে ওঠে আর ভাইয়ের চোখে নামে জল।

ডাক্তার সাহেব বলে ওঠেন, 'এরপর থেকে খেয়াল রাখতে হবে ওর কাছে মোবাইল কেনো, একটা কলমও যাতে না থাকে।'

তা র অ ভি মা ন এ ব ং তা র মৃ ত্যু

'মানুষকেই চেনা যায়না আর সেই মানুষের মন চেনাতো অনেক দুঃসাধ্য বিষয়।

আগে তবুও মনে রাখা যেত মনের বাস্তব অবাস্তব ছাড়িয়ে মনের পড়তে পড়তে লুকানো কল্পনাগুলোও। বয়সের সেই তো এক মহাদোষ। বাড়তে থাকে আর কমাতে থাকে মনের মনে রাখার ক্ষমতা।'

কথাগুলো মনে মনে ভাবতে ভাবতে রাস্তার ও পাশের জাতীয় জাদুঘরটি তিনি চিনতে পারলেন। চিনতে পারলেন শাহবাগ মোড় এবং তার পশ্চিম পাশের পিজি হাসপাতাল আর পূর্বে ডায়াবেটিস হাসপাতাল, সবই। অথচ তিনি কিন্তু মনে করতে পারছেন না কোথায় যাবার জন্যে এই রোদ হেসে ওঠা সকালে তিনি হাঁটছেন।

ফুলের দোকানে রঙ বেরঙের ফুল গুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন।

মনে পড়ল, ঢাকা মেডিকেলের ছোট একটা কেবিনে ছোট শুয়েছিলেন। সেখান থেকেই উঠে শুরু করেছিলেন হাঁটা। কখন এই এতদূর এসে হাজির হয়েছেন বুঝতেই পারেননি। স্মৃতি শক্তি যতই দূর্বল আর ক্ষীণ হয়ে উঠুক না কেনো একটা দৃঢ় অংশ ঠিকই কাজ করে, যে অংশ গড়া তার এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে রাগ আর অভিমানে, যেখানে দীর্ঘদিনের কর্ষন। ভীষণ মজবুত ভীত অভিমানে গড়া পিলারগুলো মনে তার।

মনের আরও একটা অংশ নিখাদ এবং প্রচন্ড স্বতঃস্ফুর্ত ও বটে, সেটুকু ভালবাসা, যে ভালবাসা দেশের প্রতি, মায়ের প্রতি, প্রিয়তমা স্ত্রী আর প্রতিটি সত্যিকারের মানুষের প্রতি।

'আপনি কোথাও যাইবার জন্য বের হননাই। মুক্তির জন্য হাসপাতাল ছাড়ছেন। খুব বেশী ভুইলা যান আজকাল।'

স্ত্রী সৌরভজানের কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেলেন নাঈমুল হাসান। চোখের জ্যেতি কমে গেছে, তারপরও বউ এর মুখটা ভীষন স্পষ্ট। সে নারী যে চির যৌবনা, মাত্র ১৫ কি ১৬ বছর বয়স। কাঁচা হলুদ থেকে একটু কম উজ্জ্বল গায়ের রং । চোখ দুটো বেশী পরিমানেই বড় তার। সেখানেই আকর্ষন বেড়ে যেত অনেকখানি। সরু ঠোঁট হতে হাসি তার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সে চোখ দুখানায়। সেই ডিম্বাকার মুখ, সেই করুন চাহুনী এই মুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পেলেন নাঈমুল সাহেব।

বড় বড় চোখ দুখানা মেলে চেয়ে ছিল। ঘোমটার ছায়া আড়াল করতে চাইলেও ধরা না পড়ে উপায় ছিলনা। মুখে ছিল তারপরও কষ্ট লুকানো মিষ্টি হাসির পরশ, সাহস দিচ্ছিল অমায়িক কণ্ঠে বলিষ্ঠ উচ্চারণে, ' আপনি যান , দেশটারে মুক্ত কইরাই তবে ফিরা আইসেন।'

হাত বাড়িয়ে ছিলেন বউটার হাত টা ধরার জন্য একটু যাবার আগে সেই অজানা গন্তব্যে।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, হাত সে বাড়িয়ে দিয়েছিল, ধরেছিল ঠিকই কিন্তু মুখে ছিল, ' আপনি যান, মা জাগার আগেই চইলা যান, দেশ মারে উদ্ধার কইরা আনেন। এক মা নিশ্চয় আরেক মায়ের যন্ত্রনা বুঝবই। অপেক্ষায় থাকুম, আপনি যান তো।'

মাত্র ৬ দিন আগে বিয়ে করা বউটির দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে সে রাত গভীরে আঁধারে পথে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি। শেষ চাহুনিতে বউটার চোখের পানিতে দেখেছিলেন সত্যি অপূর্ব এক আনন্দ ঝিলিক। সেই ঝিলিকই তো মনে সেদিন জুগিয়েছিল অফুরন্ত সাহস।

সেই একই চেহারা বউটার আজও। একটুও বয়স বাড়েনি। সেই সবুজ পেড়ে শাড়ীটা ঘোমটা হয়ে আজও চোখের পানিতে ছায়া ফেলছে। বলছে যেন আজও , ' যান, আপনি যান... ... '

নাঈমুল সাহেব যেতে শুরু করলেন, ডানে মোড় নিয়ে তিনি চলে এলেন শিশুপার্কের সামনে।

আশ্চর্যজনক ভাবে বাম হাতের ব্যাথাটা সকাল থেকে খুব একটা কষ্ট দিচ্ছেনা। পেটের ব্যথাটা অবশ্য কিঞ্চিৎ বাড়তে শুরু করেছে।

' বউ , আমার তো অসুখ, সে কারনেই তো হাসাপাতালে ছিলাম, মনে পড়েছে।'

মনে মনে কথা গুলো বলেই পেছনে ঘুরতে গেলেন।

তিনি স্পষ্ট শুনলেন সৌরভজান বলে উঠল কানে কানে, 'যান , ওদিকে কেন , সামনে যান।'

তিনি রোবটের মতো সত্যি রাস্তা পার হয়ে ওপাশে চলে গেলেন। রমনার আস্ত াচল নাম দেয়া গেট দিয়ে ভেতরেও ঢুকে পড়লেন। সবুজ গাছ আর গাছের তলে এত সুন্দর ছায়া দেখে তার ভীষণ ভাল লাগতে শুরু করেছে। মনে ভাবলেন এই গাছ , এই ছায়া সুনীবিড় এ সবই তো তার মুক্তিযুদ্ধের ফসল। কেউ এসে আজ কেড়ে নেবেনা এই সবুজ শ্যামলিমা , এই স্বচ্ছ লেক। হঠাৎ সব ব্যাথা উবে গেলো, বুক ফুলে উঠল ভীষণ গর্বে। কি নির্দ্বিধায় তিনি ঘুরছেন, এই তো স্বাধীন দেশ, স্বাধীন দেশের প্রতিটি জিনিস চারপাশে যেন হেসে উঠছে মন খুলে তাকে দেখে, তারা সব চিনতে পেরেছে যেন সেনার একছেলেকে দেশের ।

হঠাৎ একসাথে অনেকগুলো কাক ডেকে উঠল। মনে খচখচ- সব যেন হঠাৎ তার কাছে মনে হলো আবার উল্টো করে, উপহাসের প্রতিচ্ছবি।

স্পষ্ট মনে করতে পারছেন, তিন দিন আগে শুয়ে ছিলেন ঢাকা মেডিক্যালের করিডরে। বেড জোটেনি তবে একটা বালিশ জুটেছিল কেবল। গায়ের উপর উড়ে উড়ে এসে বসছিল নোংরা মশা মাছি অবিরত। খুব তাড়াহুড়া করেই ভাতিজাটা এক রকম পাজাকোলে করে নিয়ে আসে মেডিক্যালে। গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে সেই ভাতিজার বাসায় উঠেছিলেন, এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য এবং মস্ত ভুলটা করেছিলেন, তখনই। না, ভাতিজার বাসায় আসাটা ভুল ছিলনা। ভুল ছিল, ভাতিজার বিয়েটাকে বুক আগলে বাধা না দিতে পারার ব্যাপার টি। সাবেক এম পি আশরাফ আলী খন্দকারের ছোট ভাইয়ের মেয়েটাকে যখন প্রাণ প্রিয় ভাতিজাটা বিয়ে করতে চাইল, না তিনি ঠিকই করেছিলেন, কিন্তু তার আপন ছোট ভাইটা ছেলের বিয়েতে বড় ভাইয়ের না করার সুযোগটা সেই একবার মাত্রই দিয়েছিল যখন সে একা এসেছিল বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। পরামর্শ কেন বিয়ের আসরেই আর বড় ভাইকে ছোট ভাইয়ের এর পর প্রয়োজন হয়নি। সেই ভাতিজা বউয়ের বাসায় চিকিৎসার জন্য কেনো যে আসলো? কারও গলগ্রহ হয়ে জীবনে থাকেন নি তিনি। একটা প্রচ্ছন্ন আত্ম অহমকিা তার - ঘুন পোকার আঘাতে দূর্বল হয়নি কোনদিনই।

ভাতিজার সংসারে অশান্তির সূত্রপাত হচ্ছিল তাকে নিয়েই। গুলি লাগা সেই বাম হাতটা ইদানীং অতটা কর্মক্ষম নয়। যন্ত্রনা বাড়তেই থাকে রোজ, যন্ত্রনা বাড়তে বাড়তে যেন ছড়িয়ে পড়ে অন্য অংশেও। যেমন ছড়িয়ে পড়ে রাজাকার গুলোর বিষবাষ্প সারা দেশে। হাঁটতেও ভীষন কষ্ট হয় তখন। তার উপর পেটের মধ্যে এক বর্ননাতিত যন্ত্রনা চেপে বসে সময় সময়। ভাতিজা সে জন্যেই ঢাকায় নিয়ে এসেছিল মূলত। কিন্তু সে কি আর বুঝেছে তার লক্ষ্মী বউটার আপন সীমানার চেয়ে গ্রাম অনেক ভাল তার চাচার জন্যে। সেখানেই সে মুক্ত, অন্তত যন্ত্রনাটা তো স্বাধীন ভাবে ভোগ করা যায়। এখানে সে সুযোগ কই?

কান পাতলেই দেয়ালে বেজে ওঠে লক্ষ্মী(!) নারীর কণ্ঠ, 'দূর বুড়োটা যে কেন মরেনা...'

ছোট একটা ঘরে যে খাটটাতে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেটাকে খাট না বলে চকি বললেই যুতসই হবে।

শেষরাতে পেটের যন্ত্রনাটা বাড়ছিল । সহ্য করাই যাচ্ছিলনা। সৌরভজানের মুখটা সামনে হাজির হওয়ার পরও একটুও কমছিল না যন্দ্রনা। সেই আধো চকি আধো খাট থেকে উনি পড়েই গিয়েছিলেন।

হাসপাতালে না নিয়ে উপায় ছিলনা। জ্ঞানই তো ছিলনা। জ্ঞান ফিরে আসার পর স্মৃতির সমস্যাটাও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছিল । ঠিকমত প্রথমে ঠাওর করতেও পারছিলেন না কোথায় আছেন।

ভাতিজা একরাম এসেছিল খোজ নিতে । ওর কাছে শুনেই মনে পড়ল । খুব আফসোস করছিল ভাতিজাটা হাসপাতলে সিট পাওয়া গেলনা বলে। তবে সে আশ্বাস

দিয়ে গিয়েছিল রাতে একা রেখে চলে যাবার আগে সেই করিডোরে। পরদিন সকালে একটা ছোট্ট কেবিনেটও দেয়া হয়েছিল।

স্পষ্ট মনে পড়ছে সব নাঈম সাহেবের। পুকুরের ওপারে উল্ট পাড়ে পৌঁছে গেছেন এখন তিনি। একটা পাকা বেঞ্চ খালি দেখে বসেও পড়লেন।

অবাক হলেন হাতটা বেশ নাড়াচাড়া করতে পারছেন এখন। এই তো বাম হাতটা বাড়িয়ে পাশের আম গাছটার একটা পাতা ছিড়লেন। পেটের ব্যাথাটাও ,কমেছে, সেই সুযোগে খিদেও চলে এল পেটে। মনে পড়ল পকেটে তো একটাও টাকা নেই। হাসপাতালে যে বইটা রেখে এসেছেন তার মধ্যে ১০০ টাকা ছিল। টাকা নিয়েই বের হওয়া উচিৎ ছিল। টাকাটা দিয়েছিল গ্রামের থেকে আসার সময় তার এক কিশোর ছাত্র।

'যাক না কত কিছু ফেইলাই তো সেদিন যুদ্ধে গেছিলেন, আজও তো সেই আরেকরকম যুদ্ধ করতেই বাইর হইছেন।'

'সৌরভ , আরে তুমি কখন এসে বসলে। খুব ভাল হলো। জীবনে কোনদিন তোমার সাথে এভাবে ঘোরা হয়নি। ঐ দেখ ঐ ওখানে ছেলে মেয়ে দুটো কি সুন্দর ঘাসে বসে বসে বাদাম চিবোচ্ছে। আমরাও খাব আজ। কিন্তু বইটার জন্য মায়া হচ্ছে। আমার সেক্টর কমান্ডার স্যারের লেখা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা লেখা। '

' সে তো সব আপনার জানাই। আপনিও সে যুদ্ধের একজন রাজমিস্ত্রি। ও আপনের না পড়লেও চলবো। কিন্তু ওদের তো পড়াইতে হইব। ওরা বাদাম চিবাইতে জানে। কিন্তু জানেনা এই স্বাধীনতার পেছনের কঠিন নির্মম বাস্তব। '

'ওরা কি পড়বে আদৌ? একবার গিয়ে বইটা নিয়ে আসলে কেমন হয় বউ। ১০০ টাকাটাও পাওয়া যেত। বাদাম কিনতে হবেনা?'

'না, গেলে খুব খারাপ হইব। মনে নেই। ৭১ এর সেই রাতে যেদিন আপনি চইলা গেলেন। ফিরা আসলে কি হইতো? গ্রামের সবকজন যুবকরে সারি কইরা দাঁড় করায়ে গুলি করছিল, খোঁচাইছিল বেয়ানেট এর আগা দিয়া। নদীর পারে পড়ে ছিল লাশ গুলা। আপনারে খুঁজতাছিল বারবার। খুঁজতাছিল আপনার যারা জোট বাঁইধা যুদ্ধ যোগ দিবার রওয়ানা হইছিলেন। ওরা সে খবর পাইছিল। তবে একটু দেরী কইরাই। আপনারা রওয়ানা হইবার পর তারা আসে। শুরু হয় নিপাতনে নির্যাতন। উহ! আপনার মারে আমার সামনেই বেয়োনেট দিয়ে খুঁচায়া.., আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। মা বলছিলেন, তিনি জানেন না। আসলেই তো উনি তখনও জানতেননা। মা বলছিলেন , যদি সত্যিই আমার পোলা তোমগো মতো হারামীগো মারনের লাইগ্যা যুদ্ধে বাইর হয় , তাইলে আমি সত্যি গর্বিত মা। তারপরই তার রক্তে লাল হইয়া উঠছিল বাড়ীর উঠান। সবার শেষে মারছিল আমাকে, জরিনারে আর কুসুম রে। যদিও মরার আগেই মইরা যাচ্ছিলাম বারবার আমরা ওদের নোংরা দেহের নোংরা গন্ধের নিষ্ঠুর জঘন্য স্পর্শে । জরিনা একবার মুখ ফুইট্যা কইছিল, 'আশরাফ চাচা , আপনে আমাগো বাঁচান, আমাগো

কি দোষ। আর সহ্য করতি পারিনা। দোষের বর্ণনা দিছিল- মর মাগীরা মর, কাফের গো বউ আর গণিমতের মাল সব ভোগ করা জায়েজ, তোগো আবার বাঁচা মরা কি রে।'

তিনদিন পরে আর মরতে হলোনা। মৃত্যুই বাঁচায়ে দিল নরপশু আর তাদের হায়েনা দোসর গুলার হাত থেইক্যা। হানাদার অপারেশেনের একদিন পরেই আপনারা খবর পাইছিলেন। বেশীদূর যাননাই তখনও। সেদিন তো ফিরে আসা হয়নি। দেশ মার মুক্তির জন্য সব মায়া ছেড়ে চইল্যা গেছিলেন। আজ আর ফিইরা কি করবেন?"

' হ বউ ঠিক বলেছ। মরব, তবু ওখানে ফিরব না। স্পষ্ট শুনেছি, হাসপাতালে কোন সিট পাওয়া যাবেনা। তারপর ভাতিজা ওর শুশুরকে ধরেছিল। আশরাফ রাজাকাররেক দিয়ে ফোন করিয়ে জোগার করেছিল ঐ সিটটা। সেই কেবিনে কেমন করে থাকি?

এমন তো হবার কথা ছিলনা। কেন হলো?

স্বাধীনতা তো ঠিকই আনছিলাম। কেবল পোষ মানাইতে পরিনাই। ঠিকই পরতাম। গুলি খাওয়া হাতের চিকিৎসার পর যখন ভারত হতে ফিরলাম, বিজয়ের অনেক পরে। শুনলাম সাধারণ ক্ষমায় ছাড়া পেয়েছেন রাজাকার আশরাফ আলী খন্দকার। সেদিন যদি ওইটারে অন্তত খতম করতে পারতাম, একটা ক্ষততো কমতো মার গা হইতে।

বউ, তারপর অনেক ঘটনা। দু দুবার এমপি হলো সেই রাজাকার। আর আমি হলাম স্মৃতি সমস্যাজনিত কারনে একজন পদচ্যুত স্কুল মাষ্টার। আরে বউ সত্যি যদি স্মৃতি নষ্ট হয়ে সব ভুলবার পারতাম তাইলে কি আর এই স্বাধীনতা এ তিতা লাগত। ছোট ভাইটার কাছে কি আর শুনতে হইতো, ভাইজান আপনে বড় বেশী পেছনে রয়ে গেলেন, না আপনারা সামনে আগাতেই জানেনা, কবে কোন লড়াই হয়েছিল সেই টা নিয়ে আজ বসে থাকলে হয় নাকি?

কিন্তু বউ ওর কি দোষ , ও তখন ছোট , সেদিন সেই বিভীষাকার রাতে ওতো ছিল নানার বাড়ি। ও তো দেখেনি, জানেনি, অনুভব করেনি মা, বোন আর বউ এর সেই নিদারুন কষ্ট। ও ফিরেছিল যুদ্ধের পরে। ওর পরম আপন জন হয়ে ওঠে সদ্য যুদ্ধ অপরাধী এক ঘৃন্য রাজাকার আশরাফ খন্দকার।

আচ্ছা বউ , খুব ফুরফুরে লাগছে , ব্যাথা গুলো একদম নেই যেন, এ কি শেষ সময়ের লক্ষণ...যুদ্ধের সময় যখন গুলি লাগল হাতে ঠিক এমন মনে হয়েছিল, মনে হচ্ছিল স্বাধীন হয়ে গেছে দেশ, কি শান্তি লাগছিল, একটুও জ্বলছিল ক্ষতস্থান, মনে হচ্ছিল আমি দেশের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছি...ঠিক আজ ও সেরকম অনুভূতি কিছুটা..যদিও এই স্বাধীনতার বাস্তবতা সেই শান্তির মাঝে যেন কালো পর্দা টেনে দিতে চাইছে বারবার...'

কথা গুলো মনে মনে অদৃশ্য চরিত্র , তার বউ এর সাথে বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন নাঈম সাহেব। গাছের ছায়ার আদরে হালকা একটা ঘুমের মাঝে

এলিয়ে যাচ্ছিলেন । কাছ থেকেই বার তের বছরের একটা পথকলি বালক খেয়াল করছিল আর শুনছিল নাঈম সাহেবের কণ্ঠে সেই বিরবির শব্দ। চোখটা বন্ধ করতেই ছেড়া গেঞ্জি গায়ে দেয়া কালো রুগ্ন বালকটি পাশে এসে বসল।

হয়তো সে এতক্ষণ বদ মতলবেই ছিল। সুযোগ কাজে লাগাতে চাইল। খুব সন্ত রপনে নাঈম সাহেবের পাঞ্জাবীর সাইড পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। প্রথমে ডান টাতে তারপর বামেও । না কোন পকেটেই সে পেলনা একটা ফুটো কড়িও। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ চোখ মেলে তাকালেন নাঈম সাহেব। চোখ খুলেই তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। সে চাহুনী যেন অন্যকারও। ঠিক চেনা চেনা না,যারা তাকে চেনেন তাদের কাছেও।

ছেলেটা ভয়ে দৌড় দিতে যাচ্ছিল। একটা হাত তখনও ছেলেটার ঢুকে আছে নাঈম সাহেবের বাম পকেটে। কি মনে করে উঠেও পেছনে তাকাল। নাঈম সাহেবকে প্রচন্ড বিমর্ষ আর করুন লাগছিল সেই মুহূর্তে বলেই হয়তো ।

‘ কি ব্যাপার তোমার হাত এখানে। তুমি কি...?’

‘ যে স্যার, সকাল থেইক্যা কিছু খাইনাই, একটা টাকা দেননা্যা, ’

‘তুমি চুরি করছিলা ? কিন্তু আমি তোমার চেয়েও গরীবরে ভাই, সব হারিয়েছি সব, দেশ মায়ের চোখের নির্দোষ পানিও হারিয়েছি রে বাবা, সব...একটু পানি খাওয়াতে পারবা, খুব তেষ্টা পাইছে।’

ছেলেটা হাত টা বের করেই ছুটে চলে গেলো। নাঈম সাহেব বসে থাকতেই পারছিলেন না এখন আর । মাথাটা এলিয়ে দিলেন বেঞ্চের উপর।

‘ বউ, দেখছ, এই শিশুটা এমনি করে চুরি করবো বলেই কি এত কষ্টের এত ত্যাগের স্বাধীনতা? কষ্ট হয় ভীষন কষ্ট। খুব তেষ্টা পাইছে বউ । খুব গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখে যেন খুব অন্ধকার ।

কই তুমি? কোথায় গেলে, দেখতে পাচ্ছিনা কেনো?’

ভুল বকতে বকতে চোখটা একটু খুলতে পারেন আবার নাঈম সাহেব। ছেলেটা ছুটে আসে হাতে একটা গ্লাসে পানি নিয়ে , তিনি দেখেন। মুখে একবার কিঞ্চিৎ হাসি দেখা যায় তার। ভাবেন, ‘ না এদের দিয়েই আবার হবে, দেশ মা এর মুখে হাসি ফিরবেই।’

একটা চোর বালক তার জন্য সত্যি পানি নিয়ে আসছে, তিনি সত্যি যেন স্বাধীনতার সূর্য উঠতে দেখেন। কিন্তু সাথে সাথেই আশরাফ খন্দকারের ঘৃনিত মুখটা ফুটে ওঠে। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পরে এক ফোটা করে জল । তিনি স্পষ্ট দেখতে পান সৌরভ জানের হাতটা বাড়ানো তার দিকে। সে ডাকছে। তিনি মনে প্রাণে সৌরভজানের সে হাতের দিকে বাড়িয়ে দিতে থাকেন তার হাতদুটো।

ছেলেটা পানি নিয়ে এসে নাঈম সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ায়। সে দেখে বুড়াটির চোখ বন্ধ। কাঁধটা হেলে আছে এক পাশে, যেন গভীর ঘুমে হঠাৎ ঢলে পড়েছেন।

ডাকতে থাকে, ‘ওঠেন. নানা ওঠেন।’
সে তখনও বুঝে উঠতে পারে না এই লোকটা আর কোনদিনই জাগবেনা।

বি ব শ চো খে র জ ল

এক.

'এক চড়ে তোর দাঁত সব ফেলায় দেবো, চিনস, আমারে চিনস?'

'স্যার ভুল হইয়া গ্যাছে, দ্যান , আবার বানায়া দিতাছি...'

'শালার মাওড়া ভূত, গাইয়্যা আবাল কোথাকার , লবন চিনির তফাৎ বোঝোছনা , দোকানদারি করতে বইছস কেন্ ?'

আরও একবার "মাওড়া ভূত " শব্দটি দ্বারা অদৃশ কোন তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে করতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যুবকটি।

তিনহাতি ছোট্ট টং দোকানটার মালিক-সমেত আলী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যুবকটির দিকে; বলে, 'স্যার চা'র দাম দেওন লাগবোনা তয় সিগারেটের দাম টা ....' যুবকটি পেছেনে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে ওঠে তিরিক্ষি মেজাজে, ' দিমুনা , এইটা তোর পানিসমেন্টে, আমারে চিনে না! ...শালা মাওড়া ...'

জীবনে এমন অদ্ভুত গালি শোনে নাই সমেত আলী । অবাক স্তব্ধ তাকিয়ে থাকে যুবকটির চলে যাওয়া পথের ধূলোয়। মাথার মধ্যে হঠাৎ ঘুরপাক খেতে থাকে "মাওড়া" শব্দটি। ভাবে -এর অর্থ কি? যুবকটি অনেক দূর চলে গেছে । বিনে পয়সায় টানতে থাকা তার সিগারেটের ধোঁয়া এখন আর দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না সমেত আলীর ।

'ঐ সমেত, এক কাপ চা দে' বলতে বলতে বেঞ্চে বসলেন সানাউল হক। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাষ্টার। মাথায় তার গোল সাদা টুপি। মুখে সুন্দর করে ছাটা দুই মিলি উচ্চতার চাপ দাড়ি। চেহারায় জ্বলজ্বলে তেলের ছাপ যেন বলে দিচ্ছে এই ব্যক্তি তার উপর মহলে তৈল ছড়াতে যথেষ্ট পারদর্শী। সমেত আলীর মতো অতি নিরিহ গোবেচারাও সেটা বোঝে। বোঝাটাই স্বাভাবিক । এত অল্প বয়সে কয়জনে আর হেডমাষ্টার হয়?

যুবকটির প্রস্থানের পথে দৃষ্টি আটকে ছিল। খেয়ালই করেনি সমেত আলী কখন হেড মাষ্টার অন্য পাশ দিয়ে দোকানে এসেছেন । সম্বিত ফিরে পেতেই 'সালাম মাষ্টর সাব ' বলেই প্রায় লাফিয়ে উঠতে গেলো ।

'কিরে সমেত, কি হইছে তোর?'

'স্যার, আগে কন "মাওড়া" মানে কি?

'এমন অদ্ভুত শব্দ আবার কোন খানে পাইলি?

'ঐ যে দেহেন, ঐ যে দূরে লাল গেঞ্চি আর নীলা চটের প্যাণ্টো পইরা যে ভদ্দর নোক যাইতাছে, ঐ হালায় গালি দিতাছিল ঐ রকম কি জানি কইয়া।'

'কেডা ...আরে আরে ঐটা , ঐটা তো সেলিম , মনতেজ মোল্লার নাতি। ঢাকা থেকে আইসে। এনতেজ মোল্লার ছোট মাইয়ার বিয়ার অনুষ্ঠান না কাল। হেয় তোরে গালি দিতে যাইব ক্যান , শিক্ষিত পোলা , শুনছি ঢাকায় বড় কলেজে পড়ে। নিশ্চিয় তুই কিছু করছস। ..'

'তাই কন, মোল্লা বাড়ীর নাতি, নানার ধাঁচ পাইবোই তো, হেগোরই তো দ্যাশ, টাকা লাগবো ক্যান?' কথাটুক মনে মনেই বলে সমেত।

' কিছু বললি।'

' না, কি আর কমু । এত শিক্ষিত ! ফাঁও খাওনের শিক্ষা ভালই শিখছে।'

'কি হইছে ভাল কইরা খুইল্ল্যা ক? কওনের আগে চা বানা' ।

'চিনির কোউট্য থেইক্যাই তো দিলাম, হেয় কয় লবনের চা বানাইছি। হাসির বাপ তো ক্ষ্যাতে যাওনের সময় চা খাইয়্যা গেলো, কই হের কাছে তো লবন লাগেনাই।'

'কই দেখি, কৌটাটা দেতো... হ লবনই তো। কোন কৌটায় কি ভরসছ খেয়াল করস নাই বোধহয়।'

চিনির কৌটা হতে একটা চিমটি মুখে পুড়ে বলল, 'হ, মাষ্টার , ঠিকই তো। ভুল তো হওনের কথা না। কাল কা বিকালেও তো চা ব্যাচলাম। কেডায় করল এই আকাম ডা? হাসির বাপের কামডা দেকছেন... হেয় যদি কইয়া যাইত তাইলে সাত সকালে এই আজিব গালি শুনন লাগে, তারউপর পাঁচখান গোল্ড লিফ গেলো ফাঁও।

'চা'র টাকা দিব না ভাল কথা। গালির সাথে কাটাকাটি। । তয় সিগারেটের দাম দিবোনা ক্যান। তুই ধরলি না?'

'কি করমু । মাওড়া ভুত শুনতে শুনতেই তো টাসকি খাইয়া গেলাম। আপনের শহুরে মানুষের শহুরে গালি। থাকুক টাকা। মাষ্টার সাব আগে কন মাওড়া মানে কি? অর্থডা একটু খুইজ্যা দেবেন?'

'দেখি, স্কুলের ডিকশনারীতে পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু মোল্লা সাহবের নাতি মাত্র দশ টাকার লাইগ্যা ...না এইটা তো ঠিফ না। মাইনসে শুনলে কি কইবো? শিক্ষিত পোলা আবার গালিও পাড়বো ক্যান? ব্যাপারটা মনতেজ মোল্লারে জানান লাগবোই..'

'দূর আপনে যে কিনা, হেরা জমিদার বংশ। জমির পর জমি কত খাইয়্যা ফেলায় আর মাত্র দশটাকা। ওতে আমার অভ্যাস আছে।'

'সমেত, এত ভালা মানুষ হওন ভালা নারে। বেমানান এই দুনিয়ায়। তার উপর মনতেজ মোল্লা ঈমানদার লোক, ধার্মিক, হের নাতি!...না তারে জানানডা আবার কর্তব্য।..দে একটা পান দে' বলেই কালো কালো দাঁড়িতে হালকা হাত বুলিয়ে টুপিটা একবার মাথা থেকে খুলে আবার মাথায় চড়াল, যাবার সময় একবার হাত ঘুরিয়ে কেবল বলল, চা আর পানের দামটা লিখা রাখিস, পরে দিমুনে।'

দুই.

"মাওড়া ভূত" শব্দটা সারদিন বড় বিরিক্ত করেছে সমেত আলীকে । মাথার ভেতর একটু পর পরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এত এত গালি শুনেছ জীবনে, এমন গালিতো সে কোন দিন শুনেই নাই। মনতেজ মোল্লার বাড়ী লাগোয়া মসজিদ হতে সমেতের কানে ভেসে এল যোহরের আযানের ধ্বনি।

তিন রাস্তার মোড়ের তার এই দোকানে বসে একা একা ভাবতে থাকে সমেত আলী। এই সময়টাতে কাষ্টমার থাকেই না বলতে গেলে। তিন রাস্তার মোড়ের এই বাজার এলাকা পুরো সুনশান হয়ে পড়ে।

'দুলাভাই, ও দুলাভাই...' গদগদ কণ্ঠে কমল কে ছুটে আসতে দেখে সমেত।

কমল তার একমাত্র শ্যালক। দুইমাস চারদিন হয়েছে মাত্র বিয়ে করেছে সে। পাশের গ্রামের মেয়ে কমলা। কমলা কে বিয়ে করে নিজেকে চরম ভাগ্যবান মেনে নিয়েছে। মনে মনে ভাবে তার জনম জনমের ভাগ্য ওমন লক্ষ্মী আর সুন্দরী একটা বউ পেয়েছে। কিই বা আছে তার। তিন কানী জমি। অর্ধেকটাতে একটা কুঁড়েঘর আর বাকী টুকুতে ধান চাষ হয়। মাত্র এক মৌসুম। বর্ষাকালে পানি জমে। এক মৌসুমের চাষ তাও নিজে করতে পারেনা। যোগার যন্তর নাই তো তার। এনতেজ মোল্লা চাষ করে । যা ধান হয় তার তিন ভাগের একভাগ মাত্র দেয় । আর আছে এই ছোট দোকান খানা। ভালই চলত সমেত আলীর যদি বাকীর খাতাটা দিনে দিনে মোটা না হতো।

সহজ সরল আর শান্ত শিষ্ঠ এসব গুণের কোনটার ই কমতি দেখা যায়না সমেতের। ঐ গুণেই হয়তো কমলা কে পেয়েছে সে। কমলাও মিষ্টি মধুর হাসি দিয়ে সে কথাই বলে তাকে।

বিয়ে করতে হবে এমন কখনও ভাবেনি সমেত। তিনমাস আগে যখন মা মারা গেলো, উপায় ছিলনা। ভাবতেই হয়েছে। বেশী দিন আর ভাবতে হলো না। গায়ের মুরব্বীরা বিয়ের আয়োজনও করে ফেললো।

পাশের গায়ের কমলার নাকি বিয়ে হয়না। বেশী জানার সাধ কখনই হয়না সমতেরে । তখনও হয়নি। তার উপর মনতেজ আর এনতেজ মোল্লার অনুরোধে ছিল তীব্র আদেশের সুর। মানা করবে কেমনে। তার চেয়ে আঢ়ষ্ট কথা, কমলাকে প্রথম যেদিন দেখল, সে মুগ্ধতার কোন হিসেবই মেলেনা। ...

কমল বেড়াতে এসেছে গতপরশুদিন। কমলের বয়স বারোর কাছাকাছি হবে। তবে দস্যিপনায় বিশ বছরের কিশোরও হার মানবে ওর কাছে। ছুটে আসতে আসতে আসতে বলল,' দুলাভাই একখান জব্বর খবর আছে, হুনবা।'

' কি খবর ক জলদি।'

' আগে একখান লেবেন চুস দেও দেহি।'

লেবুন চুসের চেয়ে শোনার আগ্রহ বেশী, তারউপর শালাকে দেবে না তো কাকে দেবে। তবে কমলের জব্বর খবর টা তেমন জব্বর মনে হলোনা সমেতের কাছে ।

কমলা তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে । আদরের বউ আজ তার জন্যে তার অতি পছন্দের ইলিশ সর্ষে রান্না করেছে।

দোকন বন্ধ করতে করতেই হঠাৎ মাথায় খুলে গেল লবন চিনির রহস্য। বুঝে গেল এইটা এই কমল শয়তান ছাড়া আর কারো কাজ না। মনে পড়েছে কাল সন্ধ্যায় কমল কে কিছুক্ষণ দোকানে রেখে গিয়েছিল একা একা।

'ঐ তুই কাল চিনি আর লবনের কৌটায় কি করছিলি ..'

সবগুলো দাঁত বের করে কমল সে কথা শুনেই দিল দৌড়।

তিন.

'ও বউ, জব্বর মজা হইছে । তোমার রান্দনের হাতখানা বেশ। আল্লাহতায়ালা তোমারে এক্কেরে হাতে ধইরা রান্দন শিখাই দিছে। আইচ্ছা আইজকাতো বাজার করি নাই, ইলিশ মাছ কোথ্যাইক্যা আইলো? '

' আরে খানতো, আইসে যেইখান থেকে হও, আইসে।'

' আরে কও না, জানতে ইচ্ছা করতাছে, তোমার বাপে পাঠাইল নাকি?'

' মোল্লার বাড়ীতে গেছিলাম। ঢেঁকিতে পাড় দেয়ার লাইগ্যা। বড় আম্মা আওনের সময় অর্ধেতখান মাছ হাতে ধরাই দিছে'

' তোমারে না কামে যাইতে মানা করছি, ক্যান গেলা।'

' হেরা ডাকলে কি আর মানা করা যায়, হেরা যে হুমুকদাতা।'

'অত বুঝিনা, আমার সোনা রাঙা বউ মাইনসের বাড়ীত কাম করবনা, বাস করবনা। এর পর আইলে কইবা তোমার প্যাটে বাচ্চা।'

কমলার মনটা হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে। মনে মনে ভাবে এনতেজ মোল্লা ভালই জানে তার বাচ্চা হওয়ার থলি ডাক্তার ফেলে দিয়েছে ঢাকাতেই । কিন্তু বলতে পারেনা তার সরল সোজা সুবোধ স্বামীকে। শুধু বলে ' লন, আরেকটা মাছের টুকরো লন, খান।'

'আইচ্ছা বউ।" মাওড়া ভূত" শব্দখান শুনছ কখনও । কওতো এইটার মানে কি?'

কমলার কানে শব্দটা মোটেও অপরিচিত নয়। ঢাকায় মনতেজ মোল্লার বড় জামাইয়ের বাড়ীতে যখন কাজ করত, ভাতের চেয়ে গালিই শুনতো হতো বেশী। ও বাসায় ধর্মের কথা যেমন বেশী গালির শব্দও তেমন রাশি রাশি। কমলা তার সরল স্বামীর মুখে এই শব্দখানা শুনে একটু অবাকই হলো।

' ..কি বউ কইতে পারলানাতো। আমিও চিন্তায় পড়ছি শুইনাই। মাথার থেইক্যা সরাইতেই পরতাছিনা। বুঝলাম না। এত এত গালি থাকতে হেয় আমারে এমুন একটা গালি ক্যান দিলো?'

' ক্যাডায়, ক্যাডায় তোমারে গালি দিছে?'

'আরে ঐ যে শহুর থেইক্যা মনতেজ মোল্লার কোন এক নাতি আইছে, সেইডা, মাষ্টার সাব কি যেন নাম কইলো ...ও..সেলিম ।'

নামটা শুনেই পুরো শরীর যেনো কেঁপে ওঠে কমলার । স্বামীকে বুঝতে দেয়না। স্বাভাবিক কথা চালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহলে কি হবে, মাথার ভেতর ঠিকই ঘুরপাক খেতে থাকে সেই বিভীষিকার দুঃসহ স্মৃতি।

ঐ সেলিমদের বাড়ীতেই তো কাজ করতো কমলা। সেলিমের বাবা একটি রাজনৈতিক দলের বড় নেতা। মুখে আট আঙ্গুল লম্বা দাড়ি। সুরমা টানা চোখ। কিন্তু সে চোখ যেন সব সময় চেয়ে থাকত কমলার উঠতি বুকে। ভাব যেন কখন ওড়নাটা সরবে আর গিলে খাবে দৃষ্টি তার ওড়নার ও পাশের সবটুকু।

ছেলে বাপের চেয়ে তিন মাত্রা বেশী। কমলার হাত থেকে পানি নেয়ার সময় বুকে তার হাত লাগবেই।

বাবার সুবাদে এলাকায় তার ভীষন দাপট।

না। কমলা ও বাড়ীর কোন স্মৃতি মনে করতে চায়না। চায়না দুর্বিসহ যন্ত্রনার ভোগান্তি হতে মুক্তির জন্যে অথবা এনতেজ মোল্লার সেই ভয়াবহ হুমকির ভয়ে। কিন্তু তারপরও মনে পড়ে যায় নামটি শুনে।

সেই এক নির্জন দুপুরে সেলিম আর তার দুই বন্ধুর সেই উপর্যুপরি নির্যাতন। সেদিন বাসায় কেউ ছিলনা। সেলিমের মা আর ছোট বোন গিয়েছিল গ্রামে বেড়াতে। কোন বাধাই টেকেনি। টেকেনি তীব্র চিৎকার বদ্ধ ঘরে। তিনজনেই ধর্ষন করেছিল একরে পর এক। সহ্য আর কতক্ষণ করতে পারে। একসময় হতে হয়েছিল অজ্ঞান। তার সে মূর্ছাই থামিয়েছিল তিন কিশোর পাষন্ডকে। না হলে মৃত্যু সেদিন বুকের উপরে উঠে নৃত্য করা শুরুই করে দিয়েছিল।

স্মৃতিতে সেই বিভৎস দৃশ্য ফুটে উঠতেই গা গুলিয়ে ওঠে কমলার । ইচ্ছে করে চিৎকার করে উঠতে, বলতে সেই দু:স্বপ্ন প্রাণপ্রিয় স্বামীটিকে, পারেনা। হারানোর ভয় হয় । ভেসে ওঠে এনতেজ মোল্লার হায়নার মত লুকানো মুখচ্ছবি।

মূর্ছা যাবার পর নিজেকে আবিষ্কার করেছিল রান্না ঘরে মেঝেতে। হাতে ছিল সেলাইনের সূচ ফুটানো। পাশের ঘর থেকে কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছিল কানে। অন্য কথা গুলো মনে না থাকলেও এনতেজ মোল্লার কথাটা তার স্পষ্ট কানে প্রবেশ করেছিল, 'ওসব বান্দীর পুতেগো সাথে সহবাস জায়েজ আছে। তারউপর বাবাজী, সেলিমরে একা ডবকা মাইয়ার সাথে বাসায় রেখে গেছ, ছলে বলে ছেলে মানুষরে তো ভুলাবেই। তুমি ওদের চেনোনা বাবাজী। যাক, যা হয়ে গেছে গেছে। কাউকে জানানোর দরকার নেই । কমলাও জানাবেনা। আমি বলে যাচ্ছি।'

চলে যাবার আগে সেলিমের চাচা এনতেজ মোল্লা সেই হায়েনার রূপটা দেখিয়ে বলেছিল, ' তোর বাবারে কয়দিন জ্যান্ত দেখতে চাস্ ...'

ভয় পেয়েছিল ভীষণ। শরীরে এবং মনেও। চুপ ছিল। চুপ থাকতে থাকতে জরায়ুতে সংক্রামনটাও চুপ চাপ ছিল। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অপারেশনরে ব্যবস্থা করেছিল সেলিমের বাবা মা। তারপর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এনতেজ মোল্লার সাথে গ্রামে। কমলার বাবা মা কেবল জেনেছিল অপারেশনের কথা ।

কাউকে জানাতে পারেনি আসল ঘটনা কিছু কমলা। বরঞ্চ আজন্ম স্বার্থপরের মতো বউ হয়ে জড়িয়েছে সমেত আলীর মতো একটা ফেরেস্তার মতো মানুষের গলায়।

'বউ , কি হইলো , কি ভাবতাছ?'

'না , কিছুনা, কই জানি শুনছিলাম শব্দটা , কই জানি.. আচ্ছা গালি দিল কেন হেয় আপনারে। আপনি আবার কিছু কন নাই তো?'

'দূর, হের খুশি লাগছে হে গালি দিছে। পৃথিবীর নিয়ম হইলো বউ, একদল হুনাইবো- একদল হুনব। আমি হইলাম পরের দলে। তয় একটা কাম খুব খারাপ কইরা গেছে মোল্লাবাড়ীর নাতি। '

' কি ?'

'আর কইওনা। সিগারেট নিল টাকা দিলনা। মাওড়া ভুত শুইনা টাসকি খাইছিলাম। টাকা না দিয়াই গেল গা। মাষ্টার সাব কইছে হের নানারে কইয়া টাকা দিয়া দিব।'

' দরকার নাই। কয়টাকা আর। থাউক। শহুরে মানুষ তার উপর মোল্লা বাড়ীর নাতি, দরকার নাই কোন কাইয্যার।

গোসল করে এসে পাশে এসে বসল কমল। সেই মিচকা হাসি দিয়া কইল, 'দুলাভাই, লবন চা কেমন লাগছিল।'

কানটা এবার হাতের কাছে পেয়ে টেনে ধরেই বলে, 'কমলা, এই , এই হারামজাদাটার লাইগ্যাই তো শহুইর‍্যা গালি হুনতে হইলো। .... ক' আর করবি এমুন কাম' বলতে বলতে পাতের থেকে মাছের টুকরোটা কমলের পাতে উঠিয়ে দেয়...

কমলার চোখে তখন ঝরে পড়ে দুফোঁটা জল।

চার

ইট বিছানো রাস্তায় খাড়া রোদ ঢালছে সূর্য। মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে উঠছে ইটের ভাঙা অংশে। চায়ের কাপগুলো ধূতে ধূতে দাঁতেও হাসির ঝিলিক দেখা যায় সমেতের। সকাল থেকে ভালই বেচাকেনা হয়েছে। মনে মনে ভাবে দুপুরে যাবার সময় কমলার জন্যে দুই হালি লাল চুড়ি কিনে নেবে। ভীষন খুশি হবে কমলা। সেদিন বলছিল হাত দুখানা খালি। যদিও মুখ ফুটে চায়নি।

এনতেজ মোল্লার ছোট মেয়ের পানচিনি অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। পুরো বাড়ী সাজানো হচ্ছে। গঞ্জের থেকে সাজানোর লোক এসেছে সকাল সকাল। যাবার সময় সমেতের

দোকানে নেমেছিল তারা। সে অনেক লোক। বিশাল আয়োজন তো। সামিয়ানা হবে। রঙিন বাতি জ্বলবে।

বাতেনের মা সেই সাত সকালে তাইতো ডাকতে এসেছিল কমলাকে। সমেত মানা করেছিল। বলেছিল তার বউ পোয়াতি। বাতেনের মা হেসেছিল। বলেছিল, 'দূর পাগলা তোর বউ পোয়াতি হইবো কেমতে।'

কথাটি তখন ওতোটা ভাবায়নি। তার উপর বড় মোল্লার বউ ডেকে পাঠিয়েছে। আদেশ করেছে। বারন কেবল মুখেই সম্ভব, সে কথা ভালই জানে সে। না খেয়েই চলে গিয়েছিল বউটা।

দশটার পরে এই তিন রাস্তার মোড়ের পুরাটাই নির্জীব হয়ে পড়ে। দোকনগুলোতে নেমে আসে পিনপতন নিরবতা। রাজ্যের অজানা চিন্তা তখনই মাথায় ঢোকে সমেতের। এই মুহূর্তে সমেতের মাথায় ঘুরছিল '..তোর বউ পোয়াতি হয় কেমতে' - কথাটুকু।'

বাতেনের ছায়া গায়ে পড়তেই সম্বিত ফিরে আসে।

' সমেত ভাই, বড় হুজুর এখনই যাইতে কইছে. দৌড়াও। '

'ক্যান?'

'জানি না তো, গিয়াই দ্যাখো না।'

'আরে , তাইতো কাল বিহানে মাষ্টার সাব তো কইয়া গেলো সকালে গিয়া টাকাটা নিয়া আইতে।'

বিকেলে গতকাল মাষ্টার এসেছিল দোকানে। বলেছিল, ' সমেত, জানস, একটুর লাইগা বেয়াদবির হাত তেকে বাঁচছি। ভগ্যিস স্কুল থেকে বের হওনের সময় ডিকশনারী দেখছিলাম। নাইলে তো মোল্লা হুজুররে বলেই দিয়েছিলাম তার নাতীর গালিবাজীর কথা। যা ইজ্জতটা বাঁচলোনা। '

সমেত বলেছিল, 'ক্যান, কি হইছে। মাওড়ার অর্থ জানতে পারছেন?'

'আরে হ। জানসিতো। আগেই কইছিলাম শিক্ষিত পোলা। গালি দিসে তাও দেখ অর্থ বুইঝা। বুঝলি "মাওড়া" মানে হইলো মাতৃহীন মানে যার মা নাই। গাধার মতো কাম করবি গালি তো দিবই। কি সুন্দর কথা "মাওড়া"।

একদম হক গালি। মোল্লা বাড়ীর নাতি। শুনছি হের বাপেও বড় আলেম। দেখছস রাগ হইছে গালি দিছে, কিন্তু কোন পাপ হয়নাই। মাশাল্লাহ। টাকার কথা হুজুর রে কইছি। রাগে হয়তো ভুলে গেছিল। তোরে গিয়া নিয়া আসতে কইছে কাইল। '

...ভাবতে ভাবতেই সমেত উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'বাতেন তুই তাইলে একটু বয় দোকানে।'

'হুজুর তোমারে দোকান বন্ধ করে যাইতে কইছে। অনেক কাম আছে। যাও যাও। আমারে একটু নন্দী গ্রামে যাইতে হইবো দই আনতে । '

বলেই বাতেন ঘুরে হাঁটতে থাকে জোরে জোরে। সমেত হাসি মুখে বন্ধ করতে থাকে দোকানের ভাঙা দরজা বাতেনের লম্বা লম্বা পদক্ষেপের দিকে চোখ যায়

সমেতের। ছয়ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান। টকটকা ফর্সা। দেখলে কেউ বলবেই না ঐ ছেলে মোল্লা বাড়ীর ছেলে না বরং রাখাল মাত্র। মাঝে মাঝে সমেত ভেবেছে, ওর মাটা ওমন কালো ঢুমসি, ও এতা সুন্দর হলো কি করে?

একবার সে বোকার মতো জিজ্ঞেসও করে বসেছিল মনতেজ মোল্লারে। মোল্লা হাসছিল আর বলেছিল, ' ওর বাবা ছিল ওমন সুন্দর এক জওয়ান। '

পরে সমেত জেনেছিল বিস্তারিত যখন মোল্লা হুজুর সাংবাদিক ডাকিয়ে এনে সমেত আর বাতেনের ইন্টারভিউ নিয়েছিল। পত্রিকায় তাদের দুজনের ছবি ছেপেছিল তখন।

মনতেজ মোল্লাকে সরকার বিশেষ সম্মান দিয়েছিল দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে মানুষ করার জন্যে। বাতেনের বাবাও মুক্তিযোদ্ধা ছিল সমেতের বাবার মতোই। অন্য গ্রাম থেকে এসেছিল সমেতের বাবার সাথে যুদ্ধের সময়। মনতেজ মোল্লা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল। পাক বাহিনীর চোখে ধুলো দিতে বাতেনের বাবা বিয়ে করে এ বাড়ীর মেয়ের মতো লালিত ঝি মেয়াটাকে। যুদ্ধে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধাই শহীদ হন। বাতেনের জন্ম হয় একসময। মোল্লা তাকে নিজ বাড়ীতে রেখেই পালেন। সমেতের তখন চারবছর বয়স। তার মাকেও মোল্লা দেখেছেন। তিন কানি জমি দিয়েছেন। সমেত বড় হলে তাকে দোকান করে দিয়েছেন তিন রাস্তার মোড়ে।

এ সবই সেদিন জেনেছিল সমেত মনতেজ মোল্লার বক্তৃতা শুনে। পত্রিকাও ওমনই লিখেছিল। দেশবাসী জেনেছিল। তারপরও কোথায় যেন একটা খটকা ছিল ঠিকই সমেতের মনে। কোথায় যেন। ঘরে তখন অসুস্থ মা ঐ খবর শুনে খুশি না হয়ে বরং বাড়িয়ে দিয়েছিল বোবা চোখের কান্না। মারা যাবার ক'মাস আগে থেকে সমেতের মা বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। কি জান বলতে চাইতেন বলতে পারতেন না। সমেতকে জড়িয়ে ধরে খালি কাঁদতেন।

....'বাতেন, ঐ বাতেন, খোড়াইয়্যা হাঁটস ক্যান। ;'

' ও কিছুনা সমেত ভাই। পইড়া গেছেলাম গাছ থেইক্যা। তুমি দৌড়াও না ক্যান....'

পাঁচ

মূল বাড়িটার পেছনে বিশাল পুকুর। পুকুরের চারপাশে নানারকম ফলের বাগান। বাম পাশে পুকুর পাড় ঘেষে একটা ছোট দোতালা বাড়ী। নিচতলার বারান্দা হতে একটা ইট বিছানো পথ সোজা নেমে গেছে মোজাইক করা পুকুর ঘাটে। মনতেজ মোল্লা যখন চেয়ারম্যান ছিলো তখন এই বাড়ীটা করেছে। সেও প্রায় দশ বছর আগের কথা। গত পাঁচ বছর ধরে তো তার ছোট ভাই এনতেজ মোল্লাই স্বঘোষিত চেয়ারম্যান।

কিন্তু না। দুভাইয়ের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ নেই। সেই একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন দুই ভাই গলাগলি করে পাকিস্তানী সেনাদের খেদমত করে ছিল ব্যবসা

বানিজ্য, শাসন শোষন সব কাজই আজও দুভাই গলাগলি করেই করে। বয়স হয়েছে ঘর থেকে তাই খুব একটা বের হয়না মনতেজ মোল্লা। সারাদিন তসবি গোনে। আর যখন তখন ফাই ফরমায়েশের জন্যে পুরানো দাসী বিশ্বস্ত বাতেনের মা তো আছেই।

আজ সকাল থেকেই মনতেজ মোল্লার বিশাল বাড়ী খাঁ খাঁ করছে। এনতেজ মোল্লার বাড়ীতে নানা আয়োজন। সবাই তাই ওখানে। ঢাকা থেকে আসা মেয়ে আর ছেলের ঘরের নাতি-পুতিরাও সব ওদিকে ব্যস্ত কেবল সেলিম বাদে। ঘরে শুয়ে একা একা মনতেজ মোল্লা ভাবছিলেন কি কি বাকী আছে আয়োজনের আর অপেক্ষা করছিলেন ছোট ভাইয়ের জন্যে। তাকে খবর দিয়েছের অনেক আগে। এখনও আসেনি।

পুকুর পাড়ের দোতলায় বামের ঘরটিতে শুয়ে শুয়ে মোবাইল টিপছিল সেলিম। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে শিউলির সাথে কথা বলতে। নেটওয়ার্ক বেশ সমস্যা করছে। ইদানীয় ঢাকায় শিউলির সাথে বেশ রোমঞ্চ চলছে সেলিমের। বিরক্তিতে মুখের চামড়া রাগে কুচকাচ্ছিল ঠিক তখনই চোখ গেলো জানালার বাইরে।

ভারী পাছাদুটো তালে তালে একবার সামনে আরেকবার আসছিল পেছনে। ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল কমলা। হাত দিয়ে ধান সরাচ্ছিল নিচে বসে বাতেনেরে মা। কমলার উন্নত পাছার সেই ক্রম নৃত্যে আটকে গেলো সেলিমের দুচোখ। লোভাতুর চোখের দৃষ্টি সেলিমের চোখ হতে মুক্ত হয়ে ততক্ষণে কমলার পা বাইতে শুর করেছে, কচি লতা লাউ গাছের মতো। বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছে ধীরে ধীরে। সেলিমের চিনতে একটুও কষ্ট হলোনা। সেই মায়া মায়া মিষ্টি মুখখানাই তো।

একটু মোটা হয়েছে, মনে মনে ভাবছে সেলিম। ঐ একটু বাড়ন্ত মেদেই তো আরও জাগছে বেশী উন্মাদনা। সারা শরীরে উত্তাপ ছড়াচ্ছে দ্রুততর সেলিমের। চোখ অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখছে ব্লাউজ ছাড়া শাড়ীর আঁচল প্যাচিয়ে থাকা বেশ বড় বৃত্তের দুটো স্তন। উপরে আড়াআড়ি কাঠটা ধরে রেখেছে দুটো হাত কমলার। বগলে হালকা কালো রেখাগুলো ঘামে চিকচিত করছে। কাপড়ের ভাজ খুবলে বের হতে চাইছে যেনো স্তনের কাম দীপ্ত আলো। ঢেঁকিতে প্রতি বার পা ফেলতেই বুকের উপরে শাড়ির পর্দা ভেঙে যেন বের হয়ে আসতে চাইছে গোলাকার চেনা রহস্য দুটো।

না। আর সহ্য করতে পারছেনা সেলিম। দুপায়ের মাঝে আগ্নেয়গিরি অভ্যন্তরীন অগ্ন্যুৎপাত শুর হয়েছে। টেবিলের উপর রাখা কাঁচের গ্লাসটা বাম হাতের ঝটকায় নিচে ফেলে দিল। জানে এ শব্দ ঐ দূরে ওপাড়ে ঘরে নানুর কানে যাবেইন না। কিন্তু ঠিকই যাবে যেখানে যাবার দরকার সেখানে।

'বাতেনের মা, বাতেনের মা, গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেছে। কাউকে পাঠাও তো ভাঙা টুকরো গুলো কুড়িয়ে নিতে।'

বাতেনের মা যে কুড়ো মাখানো হাতে আসতে পারবেনা। পরিকল্পনায় সেটা মুখ্য পয়েন্ট ছিল সেলিমের। কাজ হলো। কমলার ও কণ্ঠ বেশ চেনা চেনা লাগছিল। বাতেনের মার অনুরোধে দোতলায় উঠে এলো তবুও ঝাড়ু হাতেই। ঘরে ঢোকার আগেই

কাঁধের উন্মুক্ত অংশ শাড়ীর আঁচলে জড়িয়ে নিয়েছিল। সেলিম কে দেখে মাথায়ও উঠে এসেছিল কাপড়।

সেলিমের চোখের চাহুনী আর লুঙ্গির দিকে তাকিয়েই অশনি সংকেতের কথা কোন পা কে বলে দিতে হয়নি। স্বপ্রনোদনেই উল্টো ঘুরে দৌড়ানোর জন্যে প্রস্তুত হতেই খপ করে হাতখানা চেপে ধরে বলল সেলিম- 'খাশা শরীর বনাইছোস রে কমলা। একটু চেখে নিতে দিবিনা..'

বারন তো করবেই। চিৎকারও শুরু করতে যাচ্ছিল । কিন্তু তার আগেই স্বামীকে সব ফাঁস করে দেয়ার ভয় আর পুরানো স্মৃতির অবিচার মনে করিয়ে দিতেই চোখ মুখ কুচকে বাধ্য হয়ে উঠ গেল সেলিমের সাথে বিছানায়।

হালকা চিৎকার বাতেনের মা'র কানে ঠিকই গিয়েছিল। হয়তো বুঝেওছিল। কিন্তু কিছু করার সদ্বসাহস তার মধ্যে জন্মায়নি কখনই। ভেবে নিল ওতো রক্তের ধারায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বহু আগেই ওসব গা সওয়া হয়ে যায় তার আর তার একমাত্র সুহৃদ, সমেতের মা 'র।

ছয়.

'হুজুর , ভেতরে আসবো?'

'কে , কে?'

'আমি সমেত আলী, হুজুর।';

'ও সমেত, আয়, আয় বাছা, ভেতরে আয়। কাল কি হইছিল ? আমার নাতিরে চিনস না? দশটাকা দেয় নাই বলে সবাইরে বলে বেড়াবি নাকি? ভুলে গেছিস ঐ দোকান তোরে আমি করে দিছিলাম। আমার নাতি টাকা দিলে দিব, না দিলে না দিব। তাই বলে তারে তুই টাকা চোর কবি। তোর সাহস তো কমনা। আল্লায়ও তো সহ্য করবোনা।

'হুজুর, আপনের নাতি যে চিনতে পারিনাই, দশ টাকা লস হইলে....'

'এক চড় দিয়া তোর দাঁত সব ফেলায় দিমু। এই ল পঞ্চাশ টাকা। দশ টাকা কালকের । আর বাকী টাকা আজকে সারাদিন আমার এখানে কাম করবি তার জন্যে। দোকান আজ বন্ধ থাকুক। বাতেনের পায়ে ব্যাথা। গাছে উঠতে পারবোনা। তুই পুকুর পাড়ের গাছ থেকে দুই কুড়ি ডাব পাইড়া দে আগে। এখুনি যা। বাতেন আইলে ওরে নিয়া পুকুরে মাছ ধরতে নামবি তারপর। '

'জি হুজুর।'

'খাটের তলায় দা আর রশি আছে, নিয়া যা।'

সমেত কোমড়ে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে পুকুর পাড়ে গিয়ে হাজির হয়। নিচ থেকে দেখে নেয় কোন গাছে ভালো ডাব আছে। গাছেও উঠে যায় দ্রুত।

যে গাছটাতে সে উঠেছে তার কোনকুনি ডান পাড়েই দোতলা বাড়ীটা। ডাবের কাদিতে কোপ বসাতেই স্পষ্ট চোখ যায় দোতলায় সমেতের। খাটে শুয়ে আছে সেলিম। খালি গা। হাতে জ্বলছে সিগারেটের আগুন। এবং পরক্ষণেই দুলে ওঠে তার সারা শরীর। আরেকটু হলে পড়েই যেত। সামলে নেয়। চিনতে এবটুও কষ্ট হবার কথা নয় তার আদরের লক্ষ্মী বউটাকে। উদোম বুক। একপাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে। স্তনের ডানপাশে লাল একটা কামড়ের দাগ স্পষ্ট হলো চোখে। কোমড়ে শাড়ি জড়াচ্ছে সে মাত্র।

দ্রুত নেমে আসে গাছ থেকে সমেত। হাতে ধরা তার দা। ছুটে যায় এক দৌড়ে দোতলার দিকে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। বাতেনের মা দেখতে পায় তার সেই উদ্ভ্রান্ত দৌড়। চিৎকার করে ওঠে,' বাবা থাম, থাম বাবা, যাইসনেরে।'

কে শোনে কার কথা। মাথায় তখন রক্ত চরমে। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূণ্য।

সিঁড়িতেই মুখোমুখি কমলা আর সমেত আলী। রাগে হয়তো কোপ মেরেই বসত। শান্ত মানুষ চ্যাতলে হুশ থাকেনা। কিন্তু মারলনা। আসলে পারলনা কমলার চোখের বাধাহীন জলের তোড়ে। কমলা সিঁড়িতেই বসে পড়ল ফোঁপানো চিৎকারে দুহাতে মুখ ঢেকে।

'কিরে চেচাচ্ছিস কেনো?' বলতে বলতে সিড়িতে নেমে এসেছে ততক্ষণে সেলিমও।

'তুই, তুই এইখানে কি চাস?' বলেই সেলিম বুঝে গেল কমলার স্বামীটি আর কেউ নয় ঐ দোকানদারই। 'যাক ভাল হলো। তোর বউ যে একটা নটী মাগি, এইটা তোর আর অন্য কারও কাছ থেকে জানতে হলো না। নিজেই জানলি।'

'আপনি আপনি, একটা কুত্তা....' বলতে বলতে সমেতের হাত নিচে নেমে আসে , চোখে পানি ঝরতে থাকে আর বলে ' ক্যান, ক্যান ছোট সাব, আমার বউরে ক্যান...?'

বাতেনের মা এসে পড়েছে। সমেতর দা ধরা হাতটা চেপে ধরলো সবার আগে। সমেতের বাবার তেজ সে জানে। জানেন বলেই ভয় ছেলের মধ্যে সে তেজের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে কতক্ষণ!

'সেলিম ভাইজান, যাও উপরে যাও, আমি দেখতাছি। '

'ছোট সাব, ক্যান ক্যান, কন ক্যান ' বলে এসে কলার চেপে ধরে সেলিমের । তার আগেই হাত থেকে দা নিয়ে নেয় বাতেনের মা। এক ঝটকায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সেলিম।

বলল, ' আরে তুই তো একটা গাধার বাচ্চা। তোরে গছাই দিছে এই নষ্টা মেয়ে মানুষ। জানোস নাতো ঢাকায় আমাদের বাসায় কাজ করার সময় কত আকাম করছে ঐখানে দারোয়ানদের সাথে। আরও শুনবি, পঁচে গিয়েছিল ওর প্যাটের জরায়ু, বাচ্চা হবার থলি। ডাক্তার কেটে ফেলে দিছিল। জানস না তো কিছুই ভোদাই চন্ডি। এই মাগীর লাইগা আবার তোর দরদ! আজকেই দেখ, আমারে একলা পাইয়া কেমন

ফুসাইল। এতো করে বললাম যাও যাও সামনের থেকে। গেলই না, শাড়িটা খুলেই ফেলল...'

কমলা ফোঁপাচ্ছিল আর বলছিল , 'সব মিথ্যা সব মিথ্যা...'

চিল্লাচিল্লিতে ছুটে এলেন মনতেজ মোল্লা। অভিজ্ঞ মানুষ বেশী কিছু বলতে হলোনা। দেখেই বুঝলেন যা বোঝার। বুঝলেন ঠিক সেই সময় এসে পৌঁছানো এনতেজ মোল্লাও। অবাক হলেন না কেউ। তবে অবাক হলো মনতেজ মোল্লার সাথে ঢোকা বাতেন।

মনতেজ মোল্লা বাতেনের মাকে কিছু বলার জন্যে কাছে ডাকছিলেন। তখনই এনতেজ মোল্লা বলে উঠল, ' দাসি বান্দিগো সাথে সহবাস যায়েজ ভাইজান, ও কিছুনা। যাও যে যার কাজে যাও। বেলা গড়িয়ে এল। বাতেন যা সমেতরে নিয়া পুকুরে যা জাল ফেলা।'

চোখের জলে তাপ কমে আসা রাগটা আবার দিগুন উত্তাপে প্রজ্বলিত হলো হঠাৎ সমেতের । ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো মোটা মোটা চোখে এনতেজ মোল্লার দিকে। এনতেজ মোল্লা তখন বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলছে ক্রুর হাসি মুখে ধরে, 'ভাইজান ওর মা পাকিস্তানী হুজুর গো খেদমত করছে আর ওর বউ করছে আমাদের নাতির খেদমত, ও কিছু না। তাই না ভাইজান। শোন সমেত, 'মনিবের খেদমতেই সওয়াব। হাদিসে আছে...'

আর পারলনা। বাতেনের মার হাত থেকে দা'টা একটানে ছিনিয়ে নিয়ে কোপটা বসালো এনতেজ মোল্লার মাথা বরাবর। পাশে ছিল বাতেন। পাঠানী রক্ত গায়। বেজায় শক্তি । এক ধাক্কায় এনতেজ মোল্লারে মুহূর্তে সরিয়ে দিয়ে সমেতের হাতটা ধরতে গেল আর মুখে বলল ' না , সমেত ভাই , না...'

ধরতে পারলনা। কোঁপটা ঠিকই হাতে লাগল। মাটিতে পড়ে গেল সাথে সাথে। কনুইয়ের উপরে মাংস হাঁ হয়ে গেল বেশ কয়েক ইঞ্চি। রক্ত ঝরতে রাগল অঝোরে।

সেলিমের ও একটুও দেরী হলোনা। কিল , লাথি সমানে চলতে লাগল সমেতের উপর। এনতেজ মোল্লাও পাঞ্জাবীর হাতখানা গুটিয়ে লেগ গেল সাথে।

কমলা চিৎকার করে বারবার বলছে , ' ওনারে মাইরেন না, ওনারে মাইরেন না।'

বাতেনের মা শাড়ির আঁচল ছিড়ে বেধে দিল ছেলের হাত। বাঁধন ভিজেও রক্ত পড়তে লাগল টপটপ করে।

কত দ্রুত কত গুলো ঘটনা ঘটে গেলো। মনতেজ মোল্লা হতভম্ব হয়ে দেখছিলেন। মুখ খুললেন, 'সেলিম, ঐ দড়ি পড়ে আছে। আগে এরে বাঁধো গোয়াল ঘরে নিয়া। যাও।

এনতেজ, রহমত মিয়ারে ও বাড়ী তেকে ডেকে আন আস্তে আস্তে । কেউ জানি না জানতে পারে কিছু। ওরে বলবা বাতেনেরে গোপনে দ্রুত হাসপাতাল নিয়া যাইতে। আর শোন বাতেনের মা একদম চুপ। কমলারে তোমার সাথে সাথে রাখবা। কেউ জান কিছু

বুঝতে না পারে। মনে রাখবা বুঝস। অনুষ্ঠান শেষ হোক । কাল সমেতের ব্যবস্থা হবে। কত বড় সাহস। তোমার ছেলের সব চিকিৎসা হবে। বাপের মত পাকিস্তানী রক্ত ঝরাইসে সমেত। ওরে জ্যান্ত পুতমু আমি। হারামী শালার পুত। যে পাতে খায় সে পাতেই মুতবার চায়।'

বৃদ্ধ বয়সের ক্ষীণ তেজী কণ্ঠের এই ভাষণেই সকলে চুপসে গেল। দ্রুত সব ব্যবস্থাও নেয়া হয়ে গেল।

সাত

কমলা কাঁদতে কাঁদতে কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছে এর মধ্যে। বাতেনের মা তার পিছ ছাড়েনি একবারও। সব সময় সাথে সাথে রেখেছে। সন্ধ্যায় এনতেজ মোল্লার বাড়ীতে মহাধুমধামে অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। আটটার দিকে বাড়ীর মেয়ে মহিলারা সব গহনার আওয়াজে আভিজাত্যের সুর তুলে ক্লান্তির আড়ালে হারিয়ে গেল বাড়ী ফিরে এসে। কেউ জানল না দুপরে কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে এইখানেই।

এতক্ষণে কেউ একবারও খোঁজ নেয়নি সমেতের। কমলা কয়েকবার বলেছিল বাতেনের মাকে। নিজে যে যাবে কিন্তু এই মুখ তাকে কি করে দেখাবে, ভেবে কূল পায়নি। বাতেনের মা যাব যাব বলে সন্ধ্যা পার করছিল। নির্দেশ ছিল তেমনই। রাতের আগে খাবার দেয়া যাবেনা। একটু আগে রহমত হাসপাতাল থেকে বাতেনকেও নিয়ে এসেছে। গায়ে জ্বর ভীষণ। হাতে ব্যান্ডেজ। ঘুমাচ্ছে।

সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এত বড় বাড়ীতে। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। কমলাকে নিয়ে ধীর লয়ে গোয়ালে হাজির হলো বাতেনের মা। হাতে প্লেটে ভাত।

সমেতের কব্জিতে দড়ির চাপে লাল দাগ হয়ে গেছে। সবটুকু রাগ যেনো সে ঝেরেছে দড়িরই উপর। কথাও বলতে পারেনি। না পেরেছে করতে চিৎকার। মুখ বাঁধা গামছায়। সারা গায়ে মশার আদরের গোটা গোটা চিহ্ন। কমলা সাহস পেলনা সমেতের চোখের সামনে এসে দাঁড়ানোর। দাঁড়িয়ে থাকল দরজায়।

মুখের বাঁধন খুলতেই সমেত, ' খালাগো' বলেই চেঁচিয়ে উঠলো। 'খালা বাতেন বাইচা আছে তো? তুমি আমারে মাইরা ফেলাও , মাইরা ফেলাও খালা। '

'চুপ একদম চুপ। বাতেন ভালাই আছে। যে ভয় টা পাইতাছিলাম। তাই হইলো। তোর বাপও তো মরছিল এই ত্যাজের লাইগাই।'

' কি কও তুমি খালা, বাপজানে তো যুদ্ধে শহীদ হইছে..'

'শহীদ হইছিল রে বাপ, তয় যুদ্ধের মইধ্যে না। যুদ্ধের পরে। থাউক সে সব কথা। চল হুজুরের কাছে চল, মাফ চা হের পা ধইরা...'

' না , আগে কও আমার বাপের কি হইছিল।'

' তোর যে রাগ, তোরে কওন যাইবনা।'

'আমার মায় না তোমার পরানের সখি, হের কসম, কও, আমি চেতমুনা, কও, কও। এই দেখো কত শান্ত হইয়া গেছি।..'

'শুনবিই, তাইলে শোন..তোর বাপে যুদ্ধে যাওনের পরে গ্রামে হানাদার আর্মিরা আহে। হেগোরে দুই মোল্লা মিলা যায়গা দেয় থাকনের। খাওন দেয়। তোর মা তখন মাঝে মাঝে তোরে লইয়া আইত মনতেজ মোল্লার বাড়ী। ধান শুকাইবার কাম করতো। সেই এক রাতে পাকিস্তানী দুইটা বড় অফিসার আইছিলো। তোর মারে দেইখ্যা হেগোর কু নজর পড়ে। সেদিন তোর মা বাধ্য হইছিল আজকে যেমন বাধ্য হইছিল তোর বউ। না হলে তোরে বাঁচতে দিতনা বড় মোল্লা। মুক্তিযোদ্ধার পোলা কইয়া দিলেই তোরে ফাইড়া ফেলাইতো। হুনছি মানুষ ফাড়তে ঐ জানোয়ারগো বেশ নাকি মজাই লাগতো। তোর মারে আর সাথে আমারেও খাঁচার মইধ্যে যেমন মুরগী ঢোকায় হেমনে ঢুকাই দিছিল পার্ক আর্মিগো ঘরে। একদিন দুদিন নারে মাস কয়েক তোর মা আর আমি হেগোর খায়েস মিটাইতে বাধ্য হইছি গো বাপ। তোর মা আত্মহত্যা করবার পারে নাই তোর লাইগ্যা আর আমি তোর মার লাইগ্যা।

হের পর যুদ্ধ শেষ হইলো। দ্যাশ হইলো স্বাধীন। তোর বাপ ফিরা আইল। ততদিনে বড় মোল্লা গ্রামের চেয়ারম্যান হইয়া বসছে। যারা যুদ্ধে মারা গেছে বা দ্যাশ ছাড়ছে তাগোর জমি সব নিয়া নিল নিজেগো নামে। তোর বাবা আইসা সব শুইনা ক্ষেইপ্যা আগুন। হের হাতে তখনও অস্ত্র আছিল। মারতে গেছিল দুই মোল্লারেই। উল্টা নিজেই মরলো। লাশ পাওয়া গেছিল তিন গ্রাম পড়ে। কেউ জানেনা কেমনে মরছে। মনজেত মোল্লা হেই লাশ আননের ব্যবস্থাও করে। দাফন কাফন সব করে। ..

তোর মা তোর মুখের দিকে তাকাইয়া সব সইহ্য করতে বাধ্য হয়। হের কিছু করনেরও ছিলনা। আমি পড়লাম আরও মহা বিপদে। হারমীগোর খায়েশ মিটাইতে গিয়া আমার প্যাটে আইলো বাতেন। বাতেনের জন্মো হইলো। আমিও তোর মায়ের লাহান মায়ায় পইড়া গেলাম। যদিও প্রথম প্রথম হেরে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়া মনে হইতো সাপে ছোবল দিতাছে। মনে হইতো এক আছাড়ে মাইরা ফেলি। প্যাটের ধনরে বাবা । মায়া, মায়া দিল আটকাইয়া। নিজে তো পারি নাই। তুই পারসোছ, তুই পারছস হের বদ পাকি রক্ত ঝরাইতে, তুই পারসছ বাবা....'

'চুপ করো খালা, চুপ কর। আমি আর শুনুমুনা। অঝোরে জল ঝরছে সমেতের চোখ দিয়ে। বাতেনের মাও কাঁদছে।

কমলা সহ্য করতে পারছিলনা। তিক্ততায় আর মনের দুখে ভাবছিল গলায় দড়ি দেবে। ছুটেছিল বাগানের দিকে গোয়াল ঘরে দড়ি খুলে নিয়ে। যেতে যেত শুনছিল সমেত আলীর চিৎকার, 'খালা কমলা কই, আমার কমলা।'

ঐ ডাকে মানুষটার শান্ত মুখ চোখের সামনে উঠে এল কমলার। আর পারলনা। দৌড়ে এসে পায়ে লুটায়ে পড়ল সমেতের।

সমেত যেতে চায়নি। বাতেনের মা একাই গিয়ে লুটিয়ে পড়লো বড় মোল্লার পায়ে। বলল, 'হুজুর, সারা জীবন যা কইছেন হুনছি। টু শব্দটিও করিনাইক্যা। সমেতরে জানে মাইরেন না। ওরে ছাইরা দেন। ও চুপ থাকব। আমি কথা দিতাছি হুজুর। দয়া করেন।'

সকালে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল মনতেজ মোল্লা। এনতেজ মোল্লা যদিও রাজী হচ্ছিল না। তবুও বড় ভাইয়ের অবাধ্য হলোনা। সমেতকে ছাড়া হলো। তবে এক শর্তে। শর্ত ছিল এই গ্রাম এবং আশেপাশের দশ গ্রামেও যেন আর দেখা না যায় সমেতরে।

না মেনে সমেতের কোন উপায় ছিলনা। বাতেনের মার কথা শুনল । শুনল কমলার মুখর দিকে চেয়ে।

পরিশেষ.

সেই গোয়াল ঘরে চোখ জলে ভেজা বন্দীদশার পর কেটে গেছে তিন বছর।

রিকশা থেকে যাত্রী নামিয়ে একটু ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল রিকশাওয়ালা সমেত আলী। সে কি করে চিনবে পাশের বাড়ীটাই সেলিমদের। সমেত কে দেখে সেলিম ঠিকই চিনতে পারে। একটু মজা করার কথা ভাবে। কাছে গিয়ে ডাক দেয় 'ঐ মাওড়া-ঢাকায় আসলি কবে?'

চিনতে পারে সমেতও । রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। মাথা চাড়া দেয় বহু বছরের পুরানো চাপা পড়া রাগ। কিন্তু গরীবের আবার রাগ! রিকশা নিয়ে সামনে আগায়।

'কিরে মাওড়া তোর বউটারে দিবিনা। আরেকবার চাইখা দেখতাম। কেমন হইছে রে? স্তন দুটো আগের মতো গোল আছে তো। না কি ঝুলিয়ে দিসছ । মোটা হইছে নিশ্চয় । সেই কবে টেস্ট করছি। ভুলেই গেছি। নিয়া আয় না আরেকবার চেখে দেখি। নাকি ইতিমধ্যে টাকা বানানোর মেশিন বানাইছিস তারে...'

এবার আর রাগ সামলাতে পারলনা। হাত পাকিয়ে ঘুষি মেরে বসে সেলিমের মুখে।

সেলিমদের মহল্লা। মুহূর্তে আটদশজনের একটি দল চলে এল। মারতে মারতে রক্তাত্ব করে হাত পা ভেঙে ফেলে রাখল সমেত আলীকে বড় রাস্তর পাশে।

রিকশাটা সেদিন চুরি হয়ে গেলো। দুই বছর ধরে জমিয়ে জমিয়ে নিজের টাকায় কেনা রিকশা তার। কেউ সুহৃদ হয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে। কমলা খবরটা পেয়েছিল দুদিন পরে। উপায় ছিলনা। বস্তির একটা মেয়ে অনেকদিন ধরে পিছে লেগেছিল। তার সাথেই চলে যায় বাধ্য হয়েই দেহ বেঁচতে। দেরিতে হলেও স্বামীর চিকিৎসাটা সে করতে পারে সেই টাকায়। তারপরও পঙ্গু হয়ে যায় সমেত চিরতরে। ডান পাটা সোজা করতে পারে না। পারলনা আর কোন দিনই।

মাঝে মাঝে গভীর রাত হয় কমলার ফিরতে। আঁধার ঘরে একা ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে সমেত। পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকার সময় ঠিকই বেজে ওঠে হাতের চুড়ি

কমলার। সমেতের মনে পড়ে যায় সেই লাল চুরির কথা। সমেত কাঁদে চোখ বন্ধ করেই অপরাগতায় , নিগুড় যন্ত্রনায়। চোখের বাঁধ ভেঙে গেছে চিরতরে।

কমলাও শুয়ে পড়ে মেঝেতে আর কাঁদে ভাগ্যের কাছে পরাজয়ে আর মনেমনে ভাবে, 'যাক , বিনা পয়সায়তো কেউ দেহ ছোঁয় না আজকাল।'

রাতে তারা দু'জন আজকাল ঘুমায়না। কেবল নিরবে একজন হতে অন্যজন আড়াল হয়ে কাঁদে। কেবলই কাঁদে।

বি শে ষ ক্ষ ম তা

এক.

ঘুম থেকে জেগে উঠার পর হঠাৎ করেই মনে ওমন ধারানার জন্ম হয়েছিল। ঘুম ভাঙার পর কত কিছুই তো মনে হয়।

মনে পড়ে এক সকালে ঘুম ভাঙার পর হঠাৎ মনে হচ্ছিল আমি যেন অসুর শক্তিমান কেউ, যেন এক নব্য যুগের হারকিউলিস। গা ঝারা দেয়ার মধ্যেও সেরকম অনুভূতি উপলব্ধি হলো। হতেই পারে। একটু আগে টাটকা প্রভাতে ওমন কিছুরই স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা মাত্র ঘুষিতেই আমার কুপোকাত হয়ে গেল বিশাল দেহী এক দৈত্য।

কিন্তু না; বিছানা ছেড়ে টেবিলটা এড়িয়ে বাথরুমের দরজার দিকে এগোতেই যেই পায়ের গোড়ালীতে বেশ জোড়ে বাড়ি খেলাম, পায়ের ব্যথার তীব্রতায় হারিয়ে গেল মুহূর্তে হারকিউলিস উপলব্ধি। বুঝে নিল মস্তিষ্ক দ্রুত আমি তো সেই কবির-ই, সেই অতি তুচ্ছ মানুষ মাত্র।

অন্য আরেকদিনের কথা বলা যেতে পারে। যেদিন প্রভাতে একটু খানি আঁধারে রেষ থাকতে থাকতেই ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। স্বপ্নে সেই প্রেয়সী সুন্দরীর উষ্ণ পরশ অনুভূতিতে রেশমী পুলক জাগিয়ে তখন ও ছুঁয়ে যাচ্ছে মন প্রাণ। বাস্তবতার রুঢ়তায় ফিরে আসতে বেশী সময় লাগেনি। বিছানা ছাড়ার আগেই মনে পড়ে যায়, আরে আমিতো সেই প্রেমহীন নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ পুরষ।

তাই সেদিনও অন্য সেসব দিনের মতো স্বাভাবিক ধারণাতেই মেনে নিলাম যা মনে হয়েছে ঘুম ভাঙার পর তা আসলে পুরোটই স্বপ্নের সাময়িক প্রভাব। তারপরও বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানোর পরও কেন যেন ঐ মনে হওয়া ব্যাপারটা মন থেকে এক দম ঝেড়ে ফেলা গেলোনা। একবার ভাবার চেষ্টা করলাম- কোন সে স্বপ্ন যার জন্য এই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্ত হবার বিষয়খানা মাথায় হাড়ুডু খেলার চেষ্টা করছে। না, কিছুতেই মনে করা গেলোনা। আদৌ কি কোন স্বপ্ন দেখেছিলাম?

সামনের বারান্দায় অপ্সরী রূপ নারীটিকে দেখে আড়চোখে তাকাতেই মনে হওয়ার ব্যাপারখানা যেন দ্রুত আরও বেশী মাথা চাড়া দিল। পটাপট যেন খুলে গেলো আরও অনেক গুলো চোখ এই মনের। মুহূর্তে পড়ে ফেলল যেন সে চোখগুলো অপ্সরীর চোখের ভাষা। মনে হলো, বুঝলাম, আমিই শুধু আড়চোখে তাকাই না সেও তাকায়। মন নিশ্চিত এ ব্যাপারে। তারও মনে আকুতি ভীষন আমার সাথে একটু কথা বলার জন্যে। মনে

হলো আরে ওর নাম তো পরী, ও অনার্সে পড়ে- ফার্স্ট ইয়ারে, সাইন্সে এবং ওর সাবজেক্ট বোটানী। মনে হলো ও নিশ্চয় খুব লক্ষী একটা মেয়ে, কেবল পড়েই না ঘরের যাবতীয় কাজকর্মে এই মেয়ে নিজেকে নিয়মিত সঁপেও দেয়। এবং তার মিষ্টি মধুর হাসির মাঝে কোথাও যেন খাদও আছে তীব্র, আছে কোন গোপন গভীর সমস্যাও।

মনে তো হতেই পারে, কাউকে দেখে কত কিছুই ধারনা করা যায়। তার উপর ঘুম ভাঙার পর থেকে যখন মনে হচ্ছে আমি লাইফ রিডার বা থড রিডার এই জাতীয় কিছু একটা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছি তখন তো গত একমাস ধরে রোজ সকালে যার মুখটি দেখার জন্যে মন আকুপাকু করে ওঠে তাকে দেখে ক্ষমতার ঝাঁপি খুলতেই থাকবে। প্রিয়মুখের অধিকারীনী একটু ঝুঁকে বারান্দার সতেজ সবুজ গাছ ক'টির পরিচর্যা করতে শুরু করতেই যেই বাম হাতের কনুইটা ডান হাতে সে চেপে ধরে ব্যাথায় আলতো কুঁকড়ে উঠতে চাইল এবং পরক্ষণেই আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসিখানা তার আমাকে উপহার দিয়ে দিল, তখন আরও অনেক কিছু পড়ে ফেলতে চাইল মন। মনে হলো, কাল সে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছে। ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। মনে হলো , এই মুহূর্তে সে নিশ্চিত কিছু বলতেও চাইছে আমায়।

অবাক হতেই হলো। কেনো হবোনা? সেই মুচকি হাসির পরক্ষনে তার কণ্ঠে স্পষ্ট শুনলাম-

'এক্সকিউজ মি, আপনার নাম কি কবির?'

' হ্যাঁ, কিন্তু কেনো বলুন তো?'

হাসল আবারও , আমিও নাম জিজ্ঞেস করলাম। এবার ভীষণ অবাক হলাম । তার নাম সত্যিই পরী। জিজ্ঞাসার পরিমাণ বাড়াতে শুরু করলাম যেই অবাক হওয়ার পালা আরও বাড়তেই লাগল। সত্যিই সে বোটানীতে পড়ে এবং সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হাত ছড়ে যাওয়ার ঘটনাটা শোনার পর ঘুম পরবর্তী বিশেষ ক্ষমতার উপর আর অবিশ্বাস করা গেলোনা।

সেই দিন সেই শুভ প্রভাতে দু'দুটো বর যেন পেয়ে গেলাম- পরীর সাথে প্রেম আর মানুষের চোখ মুখ দেখে তাকে রিড করার এক গোপন বিশেষ ক্ষমতা।

দুই.

সপ্তাখানেক পরের একদিন দুপুরে ভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে ফিরছি। সাথে রিকশায় পাশে বসে আছে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আতিক। পরীর সাথে সদ্য গজিয়ে ওঠা সম্পর্কটা আতিককে একটু আধটু বলা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অবশ্য দুই পর্ব বহিঃভ্রমন আর স্পর্শ টুকুর কথা বাদ দিয়েই। যতই ঘনিষ্ঠ ইয়ার বন্ধুই হোক না কেন, নিজের স্বাভাবিকতার মাঝে আগুন জ্বালানোর ব্যতিক্রমটা প্রকাশ করাটা অনুচিৎ মনে হয়েছিল।

প্রেম হতে যাচ্ছে শুনেই ও যে অবাক, হয়ে গেছে শুনলে তো আমাকে নব আবিষ্কারের কষ্টবোধ চেপে বসবে ওর মনে নিশ্চিত। তার উপর ঢাকাইয়া ছেলে, খুত

খুতানি বেশী । বলেই তো ফেলল, ' চেহারা দেখলি আর মজে গেলি, কি জানিস ঐ পরীর সম্পর্কে। ওর পরিবারের সম্পর্কে। বি কেয়ারফুল, বুঝিবিনা , মেয়েরা কত ছলনা করতে পারে। উপরে দেখবি শক্ত বাদামের সুন্দর ঝলমলে খোসা, ভিতরে ভাঙলেই নষ্ট বাদাম। '

শুনে বেশ রাগ হচ্ছিল। একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। আসলে উত্তর খুঁজে মনে আনতে পারেলও আতিককে বলা যেতনা। ওর সাথে সম্পর্কটা অতটাই ঘনিষ্ঠ। আর আসলেই তো। কতটুকু আর জানা হয়েছে পরীর সম্পর্কে। এই যে পরীর বাবা মারা গেছেন বছর চারেক আগে, জানলাম তো এই মাত্র গত কাল রাতে। অথচ প্রেম শুরু হয়ে গেছে সপ্তাহখানেক তো পার হয়ে আরও কিছুদূর। মানুষের সম্পর্কে জানার কি আর শেষ আছে। তাহলে কিছু না জানলেই যে সম্পর্ক হবে না তা কেন। আতিককে যে এত ঘনিষ্ঠ ভাবি । ওর বাসাতেই তো কখনও যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি ওদের ঢাকাইয়া পরিবারের ঢাকাইয়া কালচারটা খুব কাছ থেকে কখনও।

কেমন পরস্পরবিরোধী কথা বলছি মনে হলো নিজের মাঝে নিজেই। কোথায় জান পড়েছিলাম, প্রেমে পড়লে ছেলেরা বোকা হয়ে যেতে থাকে। আর আমি তো আগে থেকেই ওই দলের। আরও একটু বেশী হয়ে গেলাম নাকি!

না মোটেই বোকা হলে চলবেনা। তারউপর এমন এক ক্ষমতা মনে ধারন করছি । ভুলেই তো যেতে বসেছিলাম। না গোপন ক্ষমতাটা একটু ঝালাই করা উচিৎ মাঝে মাঝে। জং ধরে যেত পারে । ইচ্ছে হচ্ছে আতিককে বলি ব্যাপারটা। নির্ঘাত পাগল ভাববে। না হলে প্রেমের দোষতো দেবেই। না থাক, বলার কি আছে।?

হলো না চেপে থাকা। ও আমার দ্বারা হয়না। রিকশায় বসে গল্পে গল্পে বলেই ফেললাম আমার মাইন্ড রিডিং এর বিষয়টা। বললাম, 'জানিস আজকাল না প্রায়ই মানুষের চোখ মুখ চেহারা দেখে তার সম্পর্কে অনেক অজানা কথা বলে দিতি পারি। আমি মনে হয় অ্যাষ্ট্রলজিষ্ট হবার বর পেয়েছি রে।'

আতিক হেসে বলে উঠল, 'ও সবাই কম বেশী পারেরে। এই দেখ তোর চোখের দিতে তাকিয়েই আমি বুঝিতে পারছি তুই অধুনা প্রেমে পড়েছিস, ও না প্রেম তোর উপর পড়েছে। কি প্রেমোচ্ছ্বাস তোর চোখে মুখে। '

' ওতো তুই জানিস বলেই মনে হচ্ছে...'

'না জানলেও বুঝতাম রে, প্রত্যেকের এক্সপ্রেশনে, আচারআচরণে তার স্বভাব, সমস্যা বা জীবন এর একটা ছাপ পড়েই থাকে। তাই পরপর দুইদিন দুই অবস্থায় একজন মানুষের চেহরার অভিব্যক্তি একই হয়না। মানুষের এই পার্থক্য তার কাছের মানুষরা নিত্যই খেয়াল করে। যদিও এড়িয়ে যায়। এড়িয়ে যাওয়াটা জীবনের স্বাভাবিকতা। ...'

'তারপরও রে, তুই বুঝবিনা, আমার ইদানিং সত্যি মনে হয় বাড়তি একটা সেন্স কাজ করে অনেক সময়ই। অনেক পরীক্ষা করেছি। কারও সম্পর্কে কিছু ধারনা করলে দেখেছি। মিলে যায়। '

'বললামই তো, মিলবেই কিছু। ভেবে দেখ যাদের উপর এই ধারনাতান্ত্রিক এক্সপেরিমেন্ট করেছিস তাদের সকলকেই কোন না কোন ভাবে তুই চিনতিছ। সামন্য হলেও। '

'চিনলেই কি সব জানা থাকেরে, এই দেখ কাল পরী কাঁদছিল। দেখেই মনে হলো ওর বাবার জন্যে কাঁদছে। মনে হলো ওর বাবা নেই। জিজ্ঞেসও করলাম। সত্যি তাইও। ওর বাবা নেই । মারা গেছেন কয়েকবছর আগে। মিললতো।'

'শোন এসব কুসংস্কার তোর মতো একজন হাইলি মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টের জন্য মানায় না। আমারা ঢাকাইয়া পোলাপান, আমাদের মাঝে অনেক অন্ধ বিশ্বাস জন্মগত ভাবে কাজ করে। আমরা বললে মানায়। তুই চেপে যা। আমাকে বলেছিস আর কাউকে বলিস না। সব কিছুর একটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে। এই ধর তুই হয়তো পরীদের বাসায় এমন কোন ঘটনা দেখেছিস..এই ধর কোন পুরুষ মানুষই দেখিসনি কোন দিন। অথবা ও এমন কিছু বলেছে নিশ্চিয় তোকে যাতে তোর মনে ঐ ধারনা জন্মেছে। '

' তুই যাই বলিস, আমি বর পেয়েছি, এটাই সত্যি।'

' ঠিক আছে তাইলে হয়ে যাক একটা পরীক্ষা।'

'ওকে, তবে কাউকে বলবিনা এই ব্যাপারে। '

'অবশ্যই, মাথা খারাপ, বলে পাগল সাজব নাকি। তিন রাস্তার মোড়ে না নেমে আমার বাসা পর্যন্ত চল। আমার বাসায়তো কোনদিন যাসনি। বাসাতেও ঘুরে আসবি। মা খুব খুশি হবে। তোক প্রতিদিন নিয়ে যেতে বলে। যা হোক আমাদের ও পাড়ায় সবইতো প্রায় আমাদের গুষ্ঠির লোকজন। কাউকে না কাউকে পরিচিত পাবই। আমি তো তার সম্পর্কে জানবই। তোকে বলতে হবে দেখে তার সম্পর্কে। দেখি কতটুকু বলতে পারিস। ঠিক আছে।'

'হুঁ , খুব ঠিক। চল।'

তিন.

তিন রাস্তায় যেখানে প্রতিদিন রিকশা থেকে নেমে যাই আমি সেখান থেকে ওদের বাসাটা খুব বেশী দূরে নয়। বড়োজোড় দেড় কিলো। একটা গলির মোচড়ে রিকশা ঢুকতেই আতিক বলে উঠল ওই গলিটা পেরোলেই পরের রোডটাই ওদের মহল্লা। চৌদ্দপুরষের বসতি এলাকা ওদের। গলির দুপাশে পরপর কয়েকটা বাকর খনির দোকান দেখে স্পষ্ট বুঝলাম খাস ঢাকাইয়া এরিয়াই বটে এটা। বাকর খনির সাথে আমার জীবনে একটা বেশ মজার গল্প আছে। এখন থাক পরে বলব কোন এক সময়।

বাকর খনির দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ পাশের রিকশা হতে একজন তিরিশ উর্ধ্ব হেভি পাঙ্খু যুবক বলে উঠল, 'ওই আতিইক্কা, কিরে কইথ্যইক্যা আইতাছোস? কলেজ গ্যাছিলি ?'

আতিক দেখলাম দ্রুত হাতখান উচাইয়া, 'হঁ,ভাইজান, আপনে কই যাইবার লাগছেন, দোকানে যাইতাচেন নি?'

উত্তর দেয়ার আগেই রিকশা পাশ কেটে চলে গেল। শুধু শুনলাম যুবকের কণ্ঠে শেষ কথা,' আতিইক্ক্যা, বিকালে আহিচ, কোড কাটাইচি ওই উত্তরের খাইল্যা মাটে।

আতিকের এই গুনটা বেশ লাগল। আমাদের সাথে ভার্সিটিতে কি সুন্দর শুদ্ধ ভাষা আর জায়গা মতো কালচার। বেশ বেশ। হঠাৎ কেন জানি বলে উঠলাম,' ওই লোকটা তোর বড় চাচার ছেলে, তাই না।'

'হঁ । তুই চিনিস কেমনে'

'ওই যে সেই ক্ষমতা।'

'ক্ষমতা না ছাই। আমিই তো ভাইজান কইলামই। আর এই মহল্লার এই বয়সী সকলেই আমার ভাইই লাগে।'

'ওকে পরীক্ষা কর না, ওই ভাইজানরে নিয়ে কি আরও কিছু বলবো?'

'না থাউক। হের সম্পর্কে চোখ বন্ধ করেই বলা যায়। দোকানে বসে কয়েক ঘন্টা দিনে। বাকী সময় আড্ডা । ব্যাস শেষ। আর কিছু নাই জীবনে। আমি লোক দেখিয়ে দিচ্ছি তোরে। আমাদের মহল্লার ঢুকি আগে ।'

এই গলিটার শেষ মাথায় গিয়ে রিকশা ওয়ালা আতিকের কথা মতো ডানে মোচর নিতেই রিকশায় বসা দুজনের চোখ গেল একসাথে প্রায় ৩০ গজ দূরে সেলুন থেকে বের হতে থাকা লোকটির দিকে। লোকটির গায়ে পাট ভাঙা সাদ ধবধবে পাঞ্জাবী চাড়ানো। লুঙ্গিটাও সাদা। তবে ধবধবে নয়, একটু ওফ হোয়াইট টাইপ। সেলুন থেকে বের হয়েই লোকটি ডানদিকে মানে যেদিক থেকে আতিক আর কবির বসা রিকশাটা ঢুকছিল তার উল্টো দিকে পা বাড়াল। ঘোরার আগ মুহূর্তে তারা দুজনে চেহাটা স্পষ্ট করে দেখল। মোটামুটি ফর্সাই মুখ। বয়সের ছাপ চেহারার গাম্ভীর্য আরও গম্ভীর করে তুলেছে। তার উপর সদ্য সেভ করা দাড়িতে আফটার সেভের উপর দুপুরের তপ্ত রোদের ঝিলিকটা খুবই স্পস্ট। এবং সেটো তার বয়সের দৃঢ়তাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। ঠোঁটের উপর মোটা মোচ। হঠাৎ আতিক রিকশা ওয়ালাটাকে থামতে বলল।

সেলুন থেকে বের হওয়া ভদ্রলোক ততক্ষণে একটা রিকশার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেসন। দর করছেন। বাম পাশটা লোকটার এখন দুজনের চোখে স্পষ্ট। আতিক নেমে সাইটে দাঁড়াল। কবির ও নামল।

আতিক বলে উঠল, 'ঐ যে ঐ লোকটাকে আমি খুব ভাল করে চিনি, আমাদের বংশেরই একজন, বেশ সম্মানিয়। দেখ ভাল করে দেখ তারপর বল ওনার সম্পর্কে।'

' হ্যাঁ মুরুব্বীয়ানা তো আছেই হাঁটা চলার ঢঙ্গে, কিন্তু খুইয়েছেন, গোপনে হলেও '

'কি খুইয়েছেন?'

'একটু একটু দেখে নিতে দেনা...দূর তো অনেক'

এই ভর দুপুরে এত সেজে কোথায় যাচ্ছেন ভদ্র লোক, আরেকটু কাছ থেকে দেখতে পারলে হতো। দু এক পা এগিয়েও গেলাম। আতিকও পেছনে পেছনে এল তবে আড়াল হতে ভুললনা। বুঝলাম নিজেকে ঐ ভদ্রলোকের দৃষ্টি সীমায় ধরা দিতে চাইছেনা এই মুহূর্তে। কেন বুঝতে পারলাম না? আরে তাহলে এই এত বোঝাবুঝির ক্ষমতা আমার সে কোথায়?

আরেকটু ভাল করে তাকাতেই চোহারাখানা লোকটার সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল আমার দৃষ্টিতে। মনে করতে পারলাম না যদিও কিন্তু নিশ্চিত ওনাকে আমি দেখেছি কোথাও, দেখেছিই। একবার নয়, অনেক বারই দেখেছি। কিন্তু কোথায় মনে করতে পারছিনা কেন। নিজের উপর বিরক্তি লাগছে। কোথায় দেখেছি, ব্যাপারটা মাইন্ড এন্ড লাইফ রিডিং বিষয়টাকে বাধা দিচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তারপরও রিকশায় উঠার কালে লোকটির চোহারা একশ আশি ডিগ্রি এঙ্গেলে ধরা পরাতে হঠাৎ মনে হলো অনেক কিছু বুঝে গেলাম। চোখই তার বলে দিল, মনে কিছু ময়লা তার এবং এই মুহূর্তে নিশ্চিত সেই ময়লা ঝড়ো বাতাসে উড়ছে, চোরের মন পুলিশ পুলিশ ব্যাপারখানা বুঝিয়ে দিল আমাকে আরও অনেক কিছু। কিন্তু বলা কি ঠিক হবে। আতিকের আত্মীয় বলে কথা। যদি ধারনা মিথ্যে হয়। নিজের প্রতি আমার অবিশ্বাস হয়ে যাবে যদি না বলি আবার। নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকা মানেই তো মৃত্যু অথবা মৃত্যুর ইচ্ছে।

দূর! না কি হবে, মিলবেই, আমি তো কনফিডেন্ট। একটু পরিবেশ হালকা করা উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলাম-'আতিক , লোকটি কি এইখানেই ব্যবসা করে। মানে এই খানে বড় বাজারে তার বিশাল কোন ব্যবসা ..?'

'আমি বলব কেন, তুই ই বল। '

'হু, এখানেই তার ব্যবসা। এবং সম্ভবত চালের আড়ত। কয় ছেলে মেয়ে আছে লোকটির তা আলাদা করে বলতে পারছিনা। তবে মোটমাট চারজন । '

চালের ব্যবসা শুনে চোখ বড় করলেও এই বার আতিক হাসল

'মার মার গুল আর কত...?'

'শুনেই নে।'

'লোকটি হঠাৎ আবার রিকশা থামাল। নেমে একটা সিগারেট নিল পাশের দোকান থেকে। টাকা দিতে দেখলাম না। বেশ আয়াসে সিগারেটটা ধরিয়েই ধোঁয়া ঠিকমতো বের হবার আগেই ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিটা করেই রিকশা উঠতে গেলো। পাশ থেকে কে যেন সালাম দিয়ে বলল, 'কাকা কই জান এই দুপুরে,'

' এইতো, একটা নতুন ব্যবাসার কাজে...'

আবার পেছনে ফিরল, কি যেন বলতে গেল পান বিড়ির দোকানদারটাকে..

আতিকের দিকে এবার আরও কনফিডেন্ট দৃষ্টি মেলে বললাম,‘ লোকটা ইদানিং ভয়ংকর কোন কাজ করেছে , সম্ভবত সে তার বড় বউকে না জানিয়ে গোপনে আরেকটা বিয়ে করেছে। এবং এই দুপুরে সে সেখানেই যাচ্ছে। ’

‘ইমপসিবল, হতেই পারেনা। লোকটি এখন বাদামতলি যাচ্ছে। ওখানে ওনার শেয়ার আছে এক চালের আড়তে। প্রতিদিন একবার করে যান।’

‘কিন্তু আজকাল যান না। ’

‘ফালতু কথা বলছিস কেন। না জেনে শুনে। ওনাকে তুই চিনিস। ’

‘না , তবে কোথায় যেন দেখেছি রে সত্যি। ’

‘ও কে চল ওনার পিছে পিছে যাব। যদি তোর কথা সত্যি হয় , সারাজীবন তোর গোলাম আমি, নচেৎ তোর খবর আছে। বন্ধুত্ব শেষ। দেখ রাজী। ’

একটু ভাবলাম। ঐ যে, নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে বেঁচেই কি লাভ।

বলেই ফেললাম,‘ চল।’

চার.

রিকশা ওয়ালাকে রাজি করানো গেলনা। যাবেই না। রিকশা ওয়ালাদের প্রতি যতই সফট কর্ণার থাকুক না কেন। মাঝে মাঝে এত মেজাজ বিগড়ে দেয় ওরা বলার মতো না। পান সিগারেটের দোকান ছেড়ে মোচ ওয়ালা মুরুব্বী রিকশায় উঠছেন আর আমরা রিকশা থেকে নামছি। তবে ভাগ্য ভাল । পাশের এক রিকশা ওয়ালা চল বলতেই রাজি হয়ে আমাদের উঠিয়ে নিল। প্রায় বিশ গজ দূরত্বে মুরুব্বীর রিকশার পেছন পেছন চলছি আমরা।

আতিকের দৃষ্টি স্বাভাবিক না। কিন্তু কিন্তু বুঝতে পারছিনা। দূর ছাই ক্ষমতার সূতোটা নিরবিচ্ছিন না। মাঝে মাঝে সূত্রহীন ঘটনার দর্শন ঘটে যাচ্ছে।

লোকটা বসে আছে দেখতে পাচ্ছি। এই ভর দুপুরে রিকশা একটু কম তো তাই। সাদা পাঞ্জাবি উড়ছে এলা বাতাসে। হঠাৎ লোকটা মেইন রোডে উঠার মোড়টাতে কনফেকশনারির দোকানে নামলেন। আমারাও রিকশা ওয়ালাকে একটু দূরত্বে থামাতে বললাম। নেমে আমিও একটা সিগারেট ধরালাম। সাধারণত আমি হিসেব কষে সিগারেট খাই এইটা অবশ্য হিসেবের বাইরে। আতিকের জন্য একটা নিতে গেলাম, ইশারায় মানা করল। ও চেয়ে আছে লোকটির রিকশার দিকে।

লোকটি আবার উঠে রিকশা কে এগোতে বলল। আতিক এবার সত্যি অবাক হলো যখন লোকটির রিকশা পুরান ঢাকার দিকে না গিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারে বড় গলিটার দিকে নেমে গেলো। আমিও একটু নিশ্চিত হলাম ব্যাটাকে দেখেছিই, কারন ওই বড় গলিটা দিয়ে খুব সহজেই আমাদের বাসার গলিতে উঠা যায়। হঠাৎ মনে হলো রিকশাটা আমাদের গলিতেই যাবে। সে কথা অবশ্য আতিককে বললাম না। আতিক আমাদের

বাসাতেও কখনও যায়নি। দেখি না শেষ মেষ কি হয়। আতিকে দিকে আর তাকাচ্ছি না আমি। ভাবনা এমন যেন একেবারে বিজয়ের বেশে তাকাব।

সত্যি সত্যি নিজের প্রতি দারুন কনফিডেন্স বেড়ে গেল। আমাদের গলিতে এবং বাসার পাশেই গিয়ে থামল রিকশা। আতিককে বললাম না সামনের বাসাটাই যে আমাদের।

লোকটা নামলো। আমরা একটু দূরে রিকশা থামিয়ে দাঁড়িয়ে। মুরুব্বী রিকশা থেকে নামতেই স্পষ্ট চিনলাম। আরে এখানেই এই বিল্ডিং থেকে ওনাকে নামতে দেখেছি কতদিন বিকেলে। চোখ এড়াবার কথাই না। এই বিল্ডিয়েই যে পরীরা থাকছে গত মাস দেড়েক ধরে। মাত্র কদিনেই ওর মত এত সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে আমার মত গোবেচারার ভাব হয়ে গেলো। অবাক হলাম মনে মনে। এই বার আতিক কথা বলে উঠল, 'তুই শিওর তুই বুঝতে পারিছ, মানে লোকটা সত্যি একটা বিয়ে করেছে গোপনে?'

' সত্যি মিথ্যে জানি নারে, মনে হয়েছে তাই বলেছি। '

'চল' বলেই একপ্রকার রিকশা ভাড়ার নামে পকেট থেকে বিশ টাকার একটা নোট বের করে আতিক রিকশা ওয়ালার হাতে ধরিয়ে দিয়ে একপ্রকার আমার হাত টেনে নিয়েই সামনে পরীদের সিড়ির দিকে এগোলো। লোকটা ততক্ষণে উঠ গেছে চার তলা বিল্ডিংটাতে। পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তারমানে এখনও উঠছেন।

হঠাৎ ভীত হলাম। মন এমন এক জিনিস দেখে ফেলল যা না দেখাই কি ভাল ছিলনা। মন কে মন বলতে চইলোনা। আসলেই যদি তাই হয়। না ..

আতিকের সাথে এবার নিজের গতিও বাড়ালাম উপরে উঠার ক্ষেত্রে।

চারতলার দরজাটা বন্ধ হলো ঠিক যখন আমরা চারতলায় উঠলাম। হ্যাঁ, ও বাসাতেই গেছে। কিন্তু ওটা তো সেই বাসাই যে বাসাটাতে আমার নব্য প্রেমিকা মেয়েটা থাকে। এখানে কি করতে এসেছেন এই ঢাকাইয়্যা মুরুব্বী। আমি মনে মনে হিসেব মিলাতে চেষ্টা করছিলাম। ততক্ষণে আতিক গিয়ে কলিংবেল টিপল। দরজা খুলে দিল যে মেয়েটা সেতো আমার পরীই। প্রথম আর শেষ প্রেম যে পরী আমার।

পরী সম্ভবত আমাকে লক্ষ্য করেনি। আতিক কে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি, কাকে চান?'

'একটু আগে আব্বাস আলী সাহেব এই বাসায় ঢুকেছেন না? '

'হু কিন্তু কেন?'

সেই মুহূর্তে স্পষ্ট বলে উঠল মন নিজের কাছে আমার, আরে আব্বাস আলী ই তো আতিকের বাবা। সব মিলে গেল এবার। ঠিক হলোনা এই সব। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই, নিয়তির খেল শুরু হয়ে গেছে।

পরীর কাছে হ্যাঁ শুনেই আতিক ভদ্রতার বালাই না দেখিয়ে বলল ওনাকে ডাকেন?'

পরী তর্ক জুড়ে দিচ্ছিল, আতিক জোড় করে ভেতরেই ঢুকে যাচ্ছিল। । হঠাৎ পেছন থেকে আমি বলে উঠলাম, 'পরী , কি ব্যপার, পাঞ্জাবী পরা লোকটা কে তোমার কে হন। আর ওকে ঢুতকে দাও সমস্যা নেই। ও আমার বন্ধু। '

আমি এই কথা বলামাত্র আতিক পিছে ঘুরে তাকাল অপলক চোখে, পরীরও চোখের পলক পড়ছেনা। পারলে যেন দুজনেই চোখের চাহুনী দিয়ে আমাকে গিলে ফেলে। তবে দুজনের গিলে খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখলাম। একজনেরটা বিস্ময় ভরা। অন্যজনেরটা রাগান্বিত।

হঠাৎ আতিক আমার কলার টেনে ধরে বলল, 'পরী, এই সেই পরী, তার মানে তুই সব জানতিছ। আর আমার সাথে করছিলি ঢং। '

পরী বলল, ' কি হয়েছে, কিছুই তো বুঝতে পারছিনা। '

'আতিক কলার ছেড়ে বলল, আগে বলেন ঐ লোকটা আপানারকে? '

' উনি আমার বর্তমান পিতা। স্টেপ ফাদার। আপনি কে?'

' আমি এ লাকটির প্রকৃত সন্তান। উনি আমার পিতা।

আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম বোকা মতো। আসলেই হতভম্ব হয়ে গেছি। পরী যখন বলল, 'কবির এসব কি, একবার আমাকে জানাতে... লোকটা সকল কে জানাতোই তো কয়েকদিনের মধ্যে, ছি। ওনার মতো একটা লোক না থাকলে আজ এই আমি আমি থাকতাম না, আমার লেখাপড়া, এই সমাজে অবস্থান কিছুই থাকত না..হয়তো খেত কুঁড়ে কুঁড়ে কত মানুষ এই দেহটাকে আর যন্ত্রনার আগুনে জ্বালাতেই থাকত আমার বিধাব মাকে...একবার বলতে একবার , আমাকে না জানিয়েই কেনো এই কাজ করতে গেলে , কেনো?' তখন হতভম্ব হতে বিমুঢ়ই হয়ে গেলাম।

কিছু বলব সেই পরিস্থিতি আর কই। কে বিশ্বাস করবে আমি কিছুই জানতাম না। সবই আমার মহা ক্ষমতার বিড়ম্বনা। বলব কি করে ইতোমধ্যে আব্বাস সাহেব আর পরীর মা যিনি আব্বাস সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী তিনিও ছুটে এসেছেন। বিল্ডিয়ের আরও দু'একজন এসে কখন হাজির হয়েছ টেরই পেলাম না। আতিক আর আব্বাস সাহেবের তর্ক হচ্ছে। খাস ঢাকাইয়্যা ভাসায়। কে বলবে তাদের ঝগড়ার ভাষা শুনলে তারা যে পিতা পুত্র। পরীর মা আতিককে অনুনয় বিনয় করে থামতে বললনে, বললেন ভেতরে গিয়ে বসতে।

আতিক এর মধ্যে একবার ফোন করে তার মাকে জানিয়ে দিয়েছে। এই বিল্ডিয়েরই একজন আবার ঠিকানাও বলে দিলেন। আমি নিরব দর্শক হয়ে দেখছিই। পরী কাঁদছে আড়ালে। চ্যাঁচ্যামেচি বাড়ছেই। যত লোক তত কথা। লোক এখন বেশ অনেকজনাই। সময় যে অনেক ক্ষণ পার হয়েছে বুঝলাম যখন একজন মহিলা আর একজন লোক এসে হাজির হলেন। আতিকের দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম, মহিলা আর কেউ নয় আতিকের মা আর সাথে আতিকের ছোট চাচা। সকলে ঘরে গিয়ে বসল। বিল্ডিয়ের লোকজনকেও চলে যেতে দেখলাম। আমি একা যেন শুধু একা সিঁড়িতে

দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। ওদের ঘরের দরজা বন্ধ হয়েছিল। এরপর কি হলো আর জানা হলেনা। বন্ধ দরজার ভেতরে আমার ক্ষমতাও কাজ করলোনা।

একসময় সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

বাসায় উঠে বারান্দায় চোখচোখি হলো পরীর সাথে। চোখ মুছছে। ইশারায় যেন সেই একই কথা বলে দিল। বলে দিল - কেন তাকে জানিয়ে ঘটালাম না এমন একটা অনভিপ্রেত ঘটনা। ওর এই ভুল আমি কি করে ভাঙাব। গেল বুঝি প্রথম প্রেম আমার শেষ হয়ে। গেল বুঝি ভুল বোঝায় তার। আতিককে ফোন দিয়েছিলাম। ফোন ধরেনি। আধাঘন্টাপর দেখেছিলাম। আরও অনেক লোক এল । দেখেই বোঝা যায় ঢাকাইয়্যা লোকজন। আতিকদের আত্মীয় স্বজনই হবে। তবে পরীদের কোন আত্মীয় স্বজন এল বলে মনে হলোনা। আসলে কেউ নেই বোধহয়। আতিকের বাবার প্রতি এই মুহূর্তে একটু হলেও শ্রদ্ধা বোধ জাগল হাজার হোক পরী দের ভীষণ উপকারই হয়তো উনি করেছেন। হয়তো কেন ভাবছি, আসলেই করেছেনই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম।

হঠাৎ দেখলাম সকলে নেমে যাচ্ছে। পরীর মা আর পরীকেও দেখলাম। একবারও উপরে তাকাল না সে। আতিক কেবল একবার তাকাল। বুঝলাম না, সত্যি বোধ কাজ করলোনা, বুঝলাম না ওটা কি রকম চাহুনী ছিল। তবে বেশী রাগান্বিত দেখলাম না ।

পরের দিন মালামালও নিয়ে গেল কতগুলো লোক এসে। পরীর মাও এসেছিলেন। পরীকে দেখিনি। ঐ শেষ পরীর মা কে দেখা ।

আতিক ক্লাশে আমার ধারে কাছেই আসতো না। প্রথম প্রথম মনে হতো রাগে । কিন্তু পড়ে বোধ বলেছিল, না , রাগ না। লজ্জা। পরীর খবরটা আর তাই জানা হলেনা। আমার প্রেমিকা আজ আমারই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বোন। ভাবতে ভালই লাগে। কিন্তু এই ভবানাটাই কষ্ট দেয়।

পরিশেষ

পরীর কথা মনে হলেই নিজের সেই ক্ষমতার উপর তীব্র রাগ হতো। ওটাকে আর পরখ না করার চেষ্টাই তাই করে গেছি পরবর্তীকালে। তবুও নিরিবিলি ক্ষণে মনে হতো যা ঘটেছে সেটার পিছে উপর ওয়ালার একটা ইশারাতো নিশ্চয় ছিল। হয়তো আমার উছিলায় পরী আর তার মার একটা স্থায়ী আশ্রয় হলো, পরিচয় হলো। হয়তো আমাকে ক্ষমতা প্রদানাটাই ছিল উছিলা। কিন্তু কাকে বলব এই কথা আমি। কে বিশ্বাস করবে। কষ্ট যে আমারই। আমি যে সত্যি ভালবাসি পরীকে। দেখা করার চেষ্টা করেছি। ওর কলেজের সামনে দাঁড়িয়েছি। বুঝেছি, টের পেয়েছি, আমাকে দেখলেই সরে পড়ে। পরে তাই চেষ্টা করাও কমিয়ে দিয়েছিলাম। মনে মনেই প্রেম আর মনে মনেই কষ্ট হয়েছিল সঙ্গী।

বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে কখন বুঝতেই পারিনি। আতিক আর আমার মধ্যে সম্পর্ক আর কখনই নরমাল হতে পারেনি। আসলে কেউ চেষ্টাই করিনি। ভার্সিটির গন্ডি পেরিয়ে যাবার পরে দেখাও হয়নি কোনদিন। অথচ থাকি কত কাছে।

চরম অবাক হয়েছিলাম গতকাল যখন আমার মোবাইলে ফোন এল আতিকের। সেই সে ঘটনার পরে দুজনার প্রথম কথা। বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছিল ওর বোনের। নামটা বলছিলনা। আমি বুঝছিলাম। তবুও জিজ্ঞেস করলাম। তোর বোন মানে কে, পরী?

ও বলেছিল, হ্যাঁ। এবং আরও বলেছিল, আমি না গেলেই ভাল হয়। এর পর আমি যখন বোকার মত বলে ফেলেছিলাম , কেন? আতিক তখন বলেছিল, পরী খুব কাঁদছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'ঠিক আছে আমি আসবনা।'

কিন্তু আমার ইনটুইশন পাওয়ার বলছিল মনে মনে, পরীই আমার বউ।

আমি যে আমার ক্ষমতার উপর আজও গোপন বিশ্বাস রেখেছি। কিন্তু সে বিশ্বাস কি আদৌ আর থাকবে কাল যখন বিয়ে হয়ে যাবে পরীর । নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকার মানেই যে মৃত্যু।

খ্যা তি প্র ক্রি য়া র উ পা খ্যা ন

এক.

অ্যাডটা তারা প্রথম পাতাতেই দিয়েছিল এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঁচটি পত্রিকায় একই দিনে।

তেমন বিশাল আকৃতির কোন অ্যাড না হলেও আলাদ একটা সৌন্দর্য ছিল সবুজ বর্ডারের উপর লাল রঙে লেখা এক ইঞ্চি দু কলামের অ্যাডটিতে। সেখানে মাত্র দুইলাইনে লেখা ছিল,

'আপনি যদি নিজেকে প্রতিভাবান মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন আমরা পারব আপনার সে প্রতিভাকে বিকশিত করে দিতে তবে এখনি ফোন করুন ০১৩৩৪৪৬৭৯৯১ নম্বরে।

অনুরোধে: সূচিত্রা চৈতালী
কামরুল আহসান দীপ্ত
বঙ্কিম হাসান প্রান্তিক'

অ্যাডের নিচে উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয় স্বনামে এতটাই বিখ্যাত যে এর চেয়ে বেশী কিছু লেখার দরকারও ছিলনা। তারউপর তিন জনের সখ্যতার খ্যাতি ছিল জনশ্রুতি মাঝে যা তিন নামের একত্র অবস্থান অতি স্বাভাবিক ভাবেই কেবল তাদেরকেই ইনডিকেট করে।

তিনজনের মধ্যে বঙ্কিম হাসান প্রান্তিক মূলত একজন সাহিত্যিক। দেশের প্রথম সারির পাঁচজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করলে সেখানে অবশ্যই এই লোকটির নাম থাকবেই। সাহিত্যিক ছাড়াও তার আরও পরিচয় আছে। তিনি একজন শৌখিন ফটোগ্রাফারও। এ পর্যন্ত তিনি অনেকগুলো এক্সিবেশনও করে বেশ সুখ্যাতিও কুড়িয়েছেন।

সূচিত্রা চৈতালী বিশিষ্ট অভিনেত্রী। এক সময় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে থাকলেও ইদানীং বয়সের কারনে মূলত একজন চরিত্রাভিনেত্রী। অভিনয়ের বাইরে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত গায়িকাও। অভিনয় মূল হলেও মাঝে মাঝে গান গেয়ে থাকেন। গানের কয়েকটা ক্যাসেটও আছে তার।

বাকী ব্যক্তিটি মানে কামরুল আহসান দীপ্ত হলেন এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী, ক্ষমতা এবং অর্থ দুদিক দিয়েই। তার সুখ্যাতির পরিমন্ডল অন্য দুজনের

চেয়েও ব্যাপক। তার পরিচয়ের শেষ নেই। তিনি একাধারে একজন পরিচালক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সংগীত শিল্পী, একজন বিশিষ্ট শিল্প সংগঠক এবং সর্বোপরী একজন শিল্পপতিও । এছাড়া তিনি চৈতালীর বর্তমান পতিদেবও বটে ।

সেকারণেই তাই যত ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট অ্যাডই হোক না কেনো ঐ তিন নাম একসাথে নিচে দেখে কারওরই চিনতে ভুল হবার কথা নয় এবং সে কারনেই গুরুত্ব পেয়েছিল যথেষ্ট আর তাই অ্যাড দেয়ার দিন সকাল থেকেই ফোনের হিড়িক পড়ে যায়।

দুই.

অ্যাড প্রকাশের পূর্বের দিনই একটা অফিস রুম এবং একজন সার্বক্ষণিক তত্বাবধায়কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অফিস রুম হিসাবে মিঃ দীপ্তর নিচতলার একটা রুম বেছে নেয়া হয়েছিল কারন নিচতলা টা পুরোটাই ছিল ওনার অফিস। বাহিরের দিকের একটা রুম পুরোপুরি এই কাজের জন্যে ছেড়ে দেন তিনি তার ব্যক্তিগত সহকারী মিস সুবর্ণাকে।

অ্যাড প্রকাশের দিন সকাল থেকেই সুবর্ণা অফিসে বসে রিসিভ করতে শুর করেছিলো সবার ফোন এবং কাজটা সে করছিল তার স্বভাব সুলভ হাস্যজ্বল মুখে। বসদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সে জানিয়ে দিচ্ছিল আগামী ৩ দিন মানে নেক্সট শনিবারের মধ্যে একটি সাদা কাগজে যে নম্বর থেকে ফোন করা হয়েছে সেই নম্বরটি এবং ফোনকারী ব্যক্তিটি কোন বিষয়ে প্রতিভাবান মনে করেন নিজেকে সেটি সহ অ্যাডদাতা তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিভা বিকাশ করতে পারবেন বলে কেনো সে বিশ্বাস করে তার কারন সংক্ষেপে লিখে অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। সুবর্ণা তাদের সাথে সাথে এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছিল যে যথাসময়ে তাদের নম্বরে এসএমএস করে অফিসের ঠিকানা দেয়া হবে।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্রয় এতটাই খ্যতিমান বা ক্ষমতাধর ছিলেন যে মোবাইল কোম্পানীকে বলে তারা সহজেই ব্যবস্থা করেছিলেন ৩দিনের জন্যে তাদের ঐ নতুন অফিসিয়াল নম্বরে যত কল রিসিভ করা হবে তাদের সকল নম্বরে অফিসের অ্যাড্রেস অটোমেটিক এসএসএস হয়ে যাবে। এছাড়া তারও আরও ব্যবস্থা করিয়েছিল ৩ দিন পর যারা ফোন করে আবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তাদের ফোন রিসিভ করা হবেনা এবং তাদের কে অটো অ্যানসার শোনানো হবে এই বলে যে,

‘ আপনি দেরী করে ফেলেছেন বলে আমরা দুঃখিত, মনে রাখবেন প্রতিভাবানরা সময়ের কাজ সময়ে করে থাকে।’

চরম প্রতিভাবান এবং সাথে সাথে খ্যাতিমান অথবা কেবল চরম খ্যতিমান ব্যক্তিমাত্রই একটু খামখেয়ালীপনা হয়ে থাকেন, এইটাই স্বাভাবিক ধরা হয়। তাই উক্ত তিন খ্যাতিমানের এই ধরনের খেয়ালী কর্মের পেছনে মূলত প্রেক্ষাপট কি ছিল জানা দরকার।

আইডিয়াটা প্রথমে আসে সূচিত্রা চৈতালীর মাথায়। হঠাৎ করেই । তবে হঠাতেরও একটা কারণ থাকে। সেরূপ কারনও ছিল। তারা তিনজন মানে সূচিত্রা, তার স্বামী মিঃ দীপ্ত এবং মিঃ বঙ্কিম একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আড্ডার জায়গাটা ছিল কামরুল আহসান দীপ্ত সাহেবের ড্রইং রুম। যে কোন আড্ডাতেই এই তিনজন সামনে নিয়ে বসেন একই সাথে ভদকা, হুইস্ক আর ওয়াইন এর বোতল। সাথে বিয়ারের ক্যানও। মাতাল হবার জন্যে নয়।

আড্ডার মাঝে তর্ক যেন চরমে পৌঁছাতে না পারে তার থেকে মুক্তির জন্যে একটা শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে। এটা অবশ্য কোন যুতসই কারন নয়। আসলে কোন কারনই দরকার নেই। তারা সবসময় ড্রিংকমস করেন তাই তাদের ত্রয়ী আড্ডাতেও তাই। কিন্তু মিঃ দীপ্ত আবার সব কাজে কারনে বিশ্বাসী। তাই একটা কারন বের করে দিয়েছে মিঃ বঙ্কিম। আর নানাপদের ড্রিংকস রাখার ব্যাপারটিকে তাদের খ্যতির নানাদিকের সাথে কমপেয়ার করা যেতে পারে।

তারা যখন আড্ডা দিচ্ছিলেন ঠিক সে সময় তাদের সামনে অন করা টিভিতে চলছিল একটি প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগীতা। আজকাল তো টিভি খুললেই দুটো জিনিসই দেখা যায় বারবার, এক ঐ প্রতিভা অন্বেষণ আর এক হলো দেদারসে টক শো, এদেশের সবাই যেন কেবলই বলতে জানে, সব জানে, কথার ঝরাতে পারে অনবরত ফুলঝুরি। প্রতিভা অন্বেষন অনুষ্ঠানটির নামছিল 'বাংলার শিল্পী তুমিই'।

তিন.

প্রতিযোগীতার আসরে বিচারকের আসন অলংকৃত করে রেখেছিলেন যে তিনজন বিচারক তারা সবাই সংগীত শিল্পি এবং তাদের খুবই পরিচিত, একসাথে অনেক সময়েই ওঠাবসা হয়েছে তাদের সাথে। বিচারক তিনজন অংশগ্রহণকারীদের পরফরমেন্স দেখে মানে গান শুনে নম্বর দিচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে জ্ঞানের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিলেন ইচ্ছেমত। যদিও বিচারকদের নম্বরের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল অগণিত দর্শকের এসএমএস ভোট ।

বিশিষ্ট তিন খ্যতিমান তাদের ড্রইং রুমে আড্ডা আর মদের আসরে ঐ অনুষ্ঠান নিয়েই হঠাৎ তর্ক শুরু করেছিলেন। মিঃ দীপ্ত বলছিলেন অনুষ্ঠানটা নাকি পুরো ব্যবাসায়ীক এক ফন্দী, টেলিকম কোম্পানীগুলোর অর্থ হাতিয়ে নেয়ার এক মহোৎসব। অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে কিছু অংশগ্রহনকারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র। প্রতিভা বিকাশ টিকাশ এখানে মূখ্য কিছুনা। প্রতিভা থাকলেই কিছু হয়না। কোন কারও প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগীতা বা করুনা না পেলে কখনই কেউ খ্যাতি পায়না। কেউ হাত ধরে না টানলে অন্যের উপরে উঠার উপায় নেই যদি না সে আর্থিকভাবে ক্ষমতাধর হয়। তিনি আরও বলছিলেন এই যে অনুষ্ঠান টিতে কারও অর্থের স্বার্থ আছে দেখেই কেউ অন্যকে ব্যবহার করছে, অন্যর প্রতিভাকে ব্যবহার করছে। অর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রতিভার বিকাশে এবং সেই সাথে অর্থবানের স্বার্থ।

বঙ্কিম সাহেব এই মতামতের ব্যাপারে স্পষ্ট দ্বিমত প্রকাশ করে বলে উঠলেন, মোটেও না। বিখ্যাত হবার জন্যে মূলত দু ধরনের ভাগ্যের কম্বিনিশন দরকার। যার প্রথম টি হলো একজেনর ভেতরে প্রতিভা থাকার ভাগ্য এবং দ্বিতীয়ত সেই প্রতিভা বিকাশের একটা সুযোগ পাওয়ার ভাগ্য। পুরো প্রক্রিয়াটাই ভাগ্যের বেড়াজালে ঘেরা। এই যে আয়োজন এখানে প্রথম ভাগ্যটা যাদের আছে তারাই তো এইখানে এই স্টেজে উঠার সুযোগ পেয়েছে। আর দ্বিতীয়ত ভাগ্য টার ক্ষেত্র বিচার করতে গেলে বলতে হয় সেটা স্বল্প মাত্রায় বিচারকদের বিচার এবং ইচ্ছের উপর নির্ভর করলেও মূল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এস এমএস এ ভোটপ্রদানকারী জনগণের উপর যারা আবার বেশীরভাগই যথাযথ গুণী বিশ্লেষক না কিন্তু তাদেও ভোটের আধিক্যই নির্ধারণ করবে কারও খ্যতি অর্থাৎ অজানা সেই জনগণের উপর নির্ভর করছে একজন প্রতিভাবানের পুরো ভাগ্য।

দুজনে এই আলোচনার ভিন্নতায় তুমুল তর্কে চলে যাচ্ছিল দেখে সুচিত্রা মুখ খুলেছিল এবং বলে উঠেছিল তার মতে প্রতিভা বিকাশের জন্যে বা খ্যাতির জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট রীতিই নাই। প্রতিভাবান ব্যক্তিই আপন প্রাণে, আপন মনে ঠিক করে নেবেন কিভাবে তিনি বিকশিত হবেন। এখানে ২য় বা ৩য় কোন কারও কোন ভূমিকা নেই। কিভাবে কি হবে বিখ্যাত হবার পথে পদক্ষেপ তা নিজে নিজে বুঝে উঠতে পারার ব্যাপরটাই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক প্রতিভা।

সূচিত্রার এই সম্পূরক প্রতিভার কথায় বঙ্কিম হো হো করে হেসে উঠছিলেন কিন্তু দীপ্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, বাজে কথা। বললেন তার প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে সেদিনের সেই মধ্যবিত্ত ঘরের একটা সাধারণ মেয়ে সূচিত্র কর্মকার কোনদিনই আচকের সূচিত্র চৈতালী হয়ে উঠতে পারতো না।

সূচিত্রাও কম যান না। বলেই ফেললেন যে তিনি সেইটা বুঝেছিলেন, বুঝেছিলেন তার প্রতিভার গুনেই যে এইটাই পথ। এগোনোর পথে পা সঠিক মতো ফেলেছিলেন বলেই খ্যাতিমান হতে পেরেছেন। এটা তার সম্পূরক প্রতিভা, মূল প্রতিভা বিকাশের সহায়ক । তিনি একটু জোরালো কণ্ঠে এমনকথাও বলে উঠলেন যে তিনি তার উপস্থিতি ছাড়াও দীপ্ত এত বিখ্যাত হতো পারতনা। এখানে একজন আরেকজনকে সহযোগীতা করেছে মাত্র অথবা করেছে ব্যবহার।

স্বামী স্ত্রীর তর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছিল দেখে বঙ্কিম থামানোর প্রচেষ্টায় বলে উঠলেন সবার কথাতেই আসলে যুক্তি আছে। তিনি আরোও বললেন তার মনে হয় খ্যাতি প্রক্রিয়ার অুনসন্ধানে তার তাদের খ্যাতিকে ব্যবহার করে নিশ্চয় কিছূ করতে পারে। তাতে তাদের তর্কও কিছুটা লাঘব হতে পারে।

এরপরপরই সূচিত্রা চৈতালী সেই প্রস্তাবটি করেছিলেন। তিনজনেরই পছন্দ হয়েছিল আইডিয়াটা। তারা ভাবছিলেন টিভি শোর মতো লোক দেখানো বা ওত কমন কিছু করবেন না বরং তাদের উদ্দেশ্য হবে প্রতিভাশালী ব্যক্তির স্বপ্রচেষ্টায় বিখ্যাত হবার

পন্থাটা ধরিয়ে দেয়া কেবল এবং তাকে দেখিয়ে দেয়া খ্যাতির পথটি। তারা মোট তিনজন প্রতিভাবান কে নির্ধারণ করবে যাদের একজন হবে অভিনয় শিল্পী, একজন লেখক আর অন্য জন সংগীত শিল্পী।

মদের নেশায় হালকা মেজাজে সবাই সেই সন্ধ্যার আড্ডায় খুবই এক্সাইটমেন্টে পরিকলপনার প্রায় পুরো অংশটাই করে ফেলেছিলেন । সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দুদিন পরে দেয়া হয় পত্রিকার পাতায় অ্যাড।

চার.

পত্রিকায় অ্যাডটি প্রকাশিত হবার ঠিক তিনদিন পর রাত ১২টায় নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে অটোমেটিক ভয়েস মেসেজটি চালু হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সুবর্ণা রিসিভ করেছিল মোট ৯৯৭ জনের কল। অসাধারণ ধৈর্য্যের সাথে সুবর্ণা তাদের প্রত্যেককেই প্রয়োজনীয় বার্তা শুনিয়ে দিয়েছিল।

সুবর্ণা মেয়েটা যেমন অসাধরণ রূপবতী তেমনই সে তড়িৎকর্মাও বটে। সে মূলত কামরুল আহসান দীপ্তের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে বেতনভুক্ত হলেও ইদানীং সে বঙ্কিম হাসানের প্রকাশনা করেসপোনডেন্স এর কাজটাও সুন্দর ভাবে রক্ষা করে আসছিল। দীপ্ত সাহেবেরও তাতে কোন আপত্তি ছিলনা। বঙ্কিম আর দীপ্তর মাঝে যে নিবীর সখ্যতা তা এই ব্যাপারটিকে সহজ করে দিয়েছিল।

এই দুজন খ্যতিমানের পেছনে বেগাড় খাটার পেছনে সুবর্ণার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার ইচ্ছে ছিল খ্যতিমান অভিনেত্রী হবার। কাজটা তার জন্যে এত সহজ ছিলনা এই কারনে যে সে ভালই জানত তার সৃজনশীলতার লেভেল বলতে গেলে জিরোই। খালি রূপ দিয়ে তো আর দর্শকের মন জয় সম্ভব না। তবুও সে আশাবাদী ছিল। সে জানত দীপ্ত আর বঙ্কিম এর সুনজর পড়লে প্রতিভা ছাড়াই তার খ্যাতি আসতে পারত। সে আরও বিশ্বাস করে পেতে গেলে কিছু তো দিতেই হয়।

তাই দীপ্ত আর বঙ্কিম এই দুজনেরই শয্যা সঙ্গী হতে তার কখনও মন বা দেহ বাধ সাধেনি। যার ফলে স্ক্যান্ডালে হোক আর কদরেই হোক তার নামটি খ্যাতিমান দুজনের পেছনে পেছনে পত্র পত্রিকায় অনেকখানি জায়গা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছিল।

বঙ্কিম তাকে বলেছে আগামী বই মেলায় তার একটি উপন্যাসে লেখিকা হিসেবে তার নাম দেয়া হবে। সে জন্যে একটা লেখাও প্রায় শেষও করে ফেলেছেন তিনি। শয্যা ভালবাসায় বঙ্কিমের তরফ থেকে সেটা তার জন্যে উপহার সরূপ ছিল। দীপ্তও কথা দিয়েছে শীঘ্রই একটা নতুন ফিল্মে সূচিত্রার সমান্তরাল একটি চরিত্রে তাকে কাস্ট করা হবে। মনে এমন দুটি আনন্দ সংবাদের জোয়ারে এতই উচ্ছলতা ছিল যে প্রতিভা অন্বেষনের কাজটি সে নিজ থেকেই অতি উৎসাহে এনজয় করছিল।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৯৯৭ জনের মধ্যে ৯০৭ জন প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে জমা দিয়ে গিয়েছিল সুর্বনার কাছে অফিসে। বঙ্কিমের বাহুডোরে শুয়ে বসে সরারাত ধরে প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজটি সুবর্ণা সমাপ্ত করেছিল বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। যদিও বঙ্কিম চাইছিল এই ৯০৭ জনের প্রত্যেককেই ডাক হোক। অন্যরাও তাতে গররাজী হয়নি। তবে কাকে আগে আর কাকে পরে ডাকা হবে তার জন্যে একটা সিরিয়াল করেছিল বঙ্কিম আর সুর্বণা।

সিরিয়াল করার ক্ষেত্রে তাদের বেশ ধকল যাচ্ছিল। কারন ঐ অল্প বক্তব্য যা লেখা ছিল সাদা কাগজগুলোতে তার মাঝে খুব একটা ভেরিয়েশন ছিলনা। শেষ মেষ তাই মোবাইল কোম্পানী থেকে তারা কলের একটা লিস্ট আনার ব্যবস্থা করেছিল এবং সেই লিস্ট দেখে অগ্রকলকারী কে আগে ডাকার ভিত্তিতে লিস্টটি তৈরী করেছিল। তার মেনে নিয়েছিল যে প্রথম কল করতে পারাটাও একটা প্রতিভার লক্ষণ অথবা ভাগ্য। দুটো যেটাই হোক সে হিসেবে তাকেই আগে সুযোগ দেয়ার উচিৎ।

খ্যাতিমান তিনজন ঠিক করেছিল তারা প্রত্যেকদিন বিকেলে ৩ ঘন্টা করে ব্যয় করবে এই আয়োজনে। এতে তাদের বিশ্রামরে একটা সুযোগ ও হবে।

অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিনের ঠিক আগের দিন মেসেজে জানানো হবে । তার পূর্বে কাউকে নয়। এতে তারা এক্সটা প্রিকউশনের সুযোগ পাবেনা। ফলে রিয়েলিটি বেশী উন্মোচিত হবে। প্রথম দিন তিনজনকে মেসেজ পাঠিয়ে আগমের সময় জানিয়ে দেয়া হয়। এই কাজটিও অটোমেটিক করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মোবাইল কোম্পানী কে বলে। তাদের কে লিস্ট দিয়ে বলে দেয়া হয়েছিল প্রতিদিন তিন জন কে মেসেজ পাঠাবার জন্যে। মোবাইল কোম্পানীর জন্যে এই কাজগুলো খুব সহজই ছিল। কেবল একটা ছোট প্রোগ্রাম তৈরী করে নেয়া জাস্ট।

নির্দিষ্ট দিন বিকেল ৪টায় অফিসে এসে পৌছান প্রথম আবেদনকারী। কামরুল আহাসন দীপ্তর অফিসের কনফারেন্স রুমে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাক্ষাতের । প্রথম সাক্ষাতকারী ছিলো ২৯ বছর বয়সী এক যুবক। নাম ইফতেখার আলম। খ্যাতিমান ব্যক্তিত্রয় মিঃ ইফতেখারের আবেদন পত্রটি সামনে নিয়ে যথাসমেই বসে ছিলেন কনফারেন্স রুমে।

তার আবেদনে লেখা ছিল, সে একজন সংগীত শিল্পী এবং সে বিশ্বাস করে অ্যাডদাতা তিনজন খ্যাতিমান তার প্রতিভা খুব সহজেই বিকশিত করে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে এই কারণে যে তারা তিনজন অতিমাত্রায় বিখ্যাত এবং আর্থিকভাবে ক্ষমতাধর। মূলত বেশীর ভাগ আবেদনে ওরকমই লেখা ছিল। বঙ্কিম সেইটা দেখে বেশ অবাকও হয়েছিলেন যদিও প্রথম দিন কল করা সাক্ষাৎকারীদের শেষোক্ত জন লিখেছিল প্রতিভা থাকলে অবশ্যই বিকাশ ঘটবে যদি ভাগ্যে থাকে। বঙ্কিক ঐ শেষোক্ত জন কে নিয়ে তাই একটু বেশী ভাবছিলেন।

পাঁচ.

ইফতেখার তিনজনের সম্মুখে এসে বসার পরে স্বাভাবিক নাম ধাম জিজ্ঞাসের পর্ব শেষ হতেই প্রথম মুখ খুলেছিলেন সূচিত্রা চৈতালী। বলেছিলেন যে সে নিশ্চয় গান গাইতে জানে বিধায়ই এখানে এসেছে বলে তারা ধরে নিচ্ছে। তাই গান শোনাটা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় না। সেটা গৌণ। গান শোনার আগে তাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে যার উপর নির্ভর করবে মূলত তার প্রতিভাবিকাশের যোগ্যতা। গান শোনা হবে তারই পরে। সাথে দীপ্তও যোগ করলেন এই বলে যে, মানুষ যখন সুযোগ পায় তখন মোটামুটি পারদর্শিতাটাও দক্ষতায় পর্যবসিত হয়। তাই সুযোগ পাওয়ার প্রচেষ্টাই পারদর্শিতার চেয়ে বড় ও ইমপরটেন্ট। বঙ্কিম যদিও এই দুজনের কথা শুনে মিটিমিটি হাসছিলেন তবুও পরমুহূর্তেই তারা বেশ সিরিয়াসের সাথেই প্রশ্ন করা শুরু করেছিলেন এবং প্রশ্নের ব্যাপারে তারা পূবেই আলোচনা করে রেখেছিলেন।

মিঃ ইফতেখার কে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন কামরুল আহসান দীপ্ত।

দীপ্তঃ আপনি কেনো বিশ্বাস করেন যে আমরা বিখ্যাত বলেই আপনাকে বিখ্যাত বানাতে পারব।

ইফতেখারঃ আপনারা তিনজন এতটাই বিখ্যাত, এতটাই খ্যাতি আপনাদের, আপনারা যাকে সাপোর্ট দেবেন তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবেই।

বঙ্কিমঃ আর আপনি আর্থিক যে ব্যাপারটার কথা লিখেছেন তার কারন কি?

ইফতেখারঃ ঐ সেই একই কারন। আপনাদের অর্থ আছে, অর্থই সকল ক্ষমতার উৎস। চাইলেই অর্থ ব্যয়ে আপনারা যে কাউকে প্রমোট করতে পারবেন, মানুষের সামনে, মানুষের দোরগোড়ায় আমাকে আর আমার টেলেন্টকে হাজির করাতে পারবেন।

সূচিত্রাঃ তারমানে আপনি কি মনে করেন আপনার মাঝে কোন প্রতিভা না থাকলেও ...

ইফতেখারঃ হ্যাঁ অনেকটা সম্ভব। সুযোগ, অর্থ আর ক্ষমতা প্রতিভা তৈরী করে দেবে এমনেতেই। তবুও কিছুটা তো থাকতেই হবে।

দীপ্তঃ কিছুটা মানে কতটা।

ইফতেখারঃ একজন নায়িকা হতে গেলে চেহারা আর একজন সংগীত শিল্পী হতে গলে এটলিস্ট বাক শক্তি।

সূচিত্রাঃ গুড। ওকে এবার একটা বিশেষ প্রশ্ন। যে প্রশ্নটি আপনাকে এখন করা হবে এটি আমরা আপনার পরবর্তী সকলকেই করব। যোগ্যতা পরিমাপের এটি আমাদের নিজস্ব বিশেষ পন্থা মনে করতে পারেন।

আপনাকে বলতে হবে এই যে আমরা তিনজন খ্যাতিমান । আমাদের এই খ্যাতির পেছনের কারন কি বলে আপনি মনে করেন। আপনার কি ধারনা, আমার কিভাবে এতদূর আসতে পেরেছি।

বঙ্কিমঃ শুরু করার আগে একটু বলে রাখি যেহেতু অন্যের ব্যাপারে আপনাকে বলতে বলা হচ্ছে তাই অজান্তে সুনির্দিষ্টভাবে যে আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয় তা আমরা বুঝি। তাই আপনি মনে করবেন আমরা তিনজন হলাম এখানে একটা প্রতীক। প্রতিভা বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ধারনাটাই আপনি কেবল আমাদেরকে উপজীব্য করে বললেই যথেষ্ট হবে।

ইফতেখারঃ যেহেতু আপনারা নিজেদের ব্যাপারেই প্রশ্নটা করেছেন। তাই আশা করব যে কোন উত্তর শোনার মতো ধৈর্য্য আপনাদের আছে। পত্রিকার পাতায় আপনাদের সম্পর্কে যত লেখাই লেখা হোক না কেনো সবই আপনাদের খ্যাতির পরবর্তীকালে উন্মোচিত। তাই আপনাদের প্রতিভা ছিল, না চরম ভাগ্য ছিল নাকি চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ছিল ওত সহজে ব্যক্ত করাও যাবেনা।

তারপরও যতটুকু জানা আছে তাতে বলতে পারি কামরুল সাহেবের বাবা ছিলেন প্রাক্তন একজন মন্ত্রী। সে হিসেবে তিনি যাই করতেন তাতেই সোনা ফলত। উনি পরিচালনা শুরু করেন , নাটক বানান আর সবই সোনা হয়ে গেছে। বাবার নাম , ক্ষমতা আর অর্থই ওনার যোগ্যতার মূল।

বঙ্কিম সাহেব যখন প্রথম বই প্রকাশ করেন তখন একটা ব্যাপক কেওয়াজ হয়েছিল। যার কারন অস্পষ্ট। ওনার প্রথম বইটি ব্যান করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল বলে শুনেছি এবং সেটাই ছিল তার টার্ণিং পয়েন্ট। পাঠক খেয়েছিল। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আলাদা একটা আকর্ষন মানুষের সহজাত তো বটেই। তারপরও আমার একটা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আছে যাতে মনে হয় ঐ ব্যান বিষয়টি এবং আন্দোলন জাতীয় ব্যাপারগুলো তিনি নিজেই ব্যবস্থা করেছিলেন । কারন বইটি আমি পড়েছিলাম। উত্তেজিত হবার মতো তাতে কিছু ছিল বলে আমার কখনই মনে হয়নি।

আর সূচিত্রা ম্যাডামের চেহারটাই আর সৌন্দর্যটা ই তার বড় সম্পদ যে চেহারার অনেক রকম ব্যবহার তিনি করতে পেরেছেন বলেই সুযোগ পেয়েছেন গান গেতে আর অভিনয় করার।

ইফতেখারের এই সব উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তিনজনই এবং জনগণ তাদের নিয়ে সত্যিকার অর্থে কি ভাবে তা ভেবে তারা প্রাথমকি পর্যায়েই একটা ব্যাপক নাড়া খেলেন। কথাবার্তা তাই আর বেশী ক্ষণ চালাতে চাইলেন না। বরং এরপর ইফতেখারের প্রতিভার কিছু হালকা নিদর্শন দেখে মানে গান শুনে তাকে দ্রুত বিদায়ের ব্যবস্থা করলেন।

ছয়.

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারীকে যখন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাস করা হয়েছিল তার উত্তরও একই দিকে যেতে শুর করেছিল। যদিও তার উত্তরের মাঝে সাহসের ছাপ ছিল আরও ব্যাপক। তার বয়স ছিল আগের জনের চেয়ে দুবছর কম। সে নিজেকে একজন লেখক হিসেবে মনে

করে । অনেক পত্র পত্রিকায় গল্প কবিতা ছাপানোর ব্যর্থ প্রয়াসের পর তার কণ্ঠে সাহসিকতা ভর করেছিল চরম ভাবে। তাই প্রতিভা বিকাশ এবং খ্যাতিমান হবার পেছনে মূল কারন হিসেবে সে টেনে এনছিল আর্থিক দিকটা। সে বলেছিল মন্ত্রীদের টাকা এবং ক্ষমতা এ দেশে এতই বেশী প্রভাব ফেলে যে তারা চাইলে সব পারে এভং দীপ্ত সাহেবও সব পেরেছেন।

সে আরও একধাপ সাহসীকতার সাথে বলেই ফেলেছিল সূচিত্রা বিখ্যাত হবার পেছনে মূল কারনই হলো দীপ্ত সাহেব এবং তার পূর্বে দীপ্ত সাহেবের মতো আরও দুজনের কাছে সৌন্দর্য্য বিকিয়েই।

শুনে সূচিত্র অগ্নি মূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছিলেন তার আগেই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারী বঙ্কিমের দিকেও ফিরে উল্টো প্রশ্ন করলো আশরাফ ইনাম নামে কাউকে চেনেন কিনা। বঙ্কিমের উত্তরের অপেক্ষা না কেরই সে বলল, ' উনি আমার দাদা, আপনি স্বীকার করেন বা নাই করেন , উনাকে টেনে ধরেই আপনার হীন উত্থান। ...স্বীকার তো আপনি করবেনইনা জানি বরং উল্টো বলে বেড়ান আশরাফ ইনাম তার চাকুরী হারানোর রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে আপনার লেখা ব্যান করার আন্দোলনে নেমেছিলেন, অথচ আদতে ঐ কর্মটি আপনারই করা ছিল। আমার দাদা যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সেখানেই আপনি সামান্য একজন রিপোর্টারের কাজ করতেন। দাদা একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তখন আপনাকেই তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন এক অজানা বিশ্বাসে। আর আপনি সেই সুযোগে তার টেবিল থেকে তার লেখা সব পান্ডুলিপি আর কলাম নিজের নামে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। আর দাদার নাম দিয়ে এমন এক কলাম লিখে ছাপালেন যাতে তাকে ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই যেতে হলো জেলে। সামরিক সরকারের সুবিধাটা দারুন ভাবেই হেল্প করেছিল আপনাকে। জেলে বেশী দিন না থাকলেও দাদার ঐ অনুপুস্থিতিতে পত্রিকার পাকাপোক্ত সম্পাদক বনে গেলেন আপনি এবং ততদিনে আপনার পরম বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন মন্ত্রী পুত্র কামরুল সাহেবকে। ফলে দুজনারই হলো পোয়া বারো। একজনের ক্ষমতা আর অর্থ আরেকজনের ছাপার অক্ষরের শক্তি। ...

তার এই লম্বা বক্তৃতা এখানেই থামিয়ে দিলেন দীপ্ত, বললেন , আপনি এখন আসতে পারেন।

সাত.

প্রতিভাবিকাশের খামখেয়ালীপনাটা এরপার ওখানেই শেষ করে ফেলার কথা তিনজনেরই। কিন্তু শেষোক্ত জন নারী হওয়ায় তাকেও ডাকা হলো। তার উপর সে লিখেছিল প্রতিভার চেয়ে ভাগ্য বেশী দরকার...।

তার শুরুটা ছিল অন্যরকম। তারউপর তার তারুন্য আর যৌবন উছলানো রূপ প্রথম দর্শনেই দীপ্ত আর বঙ্কিম কে মুগ্ধ করেছিল। যদিও নারী হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই অন্য নারীর সৌন্দর্য হিংসার জাগরণও ঘটিয়েছিল সূচিত্রার মাঝে।

শিউলী নামের ঐ ২৫ বর্ষী তরুনী টি বলল, 'আপনাদের টাকা আর খ্যাতি আমার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলেও পারবেনা আমাকে একজন সফল অভিনেত্রী বানাতে । কারণ আমার প্রতিভার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমার ভাগ্য। আমার ভাগ্যে যদি থেকেই থাকে তবে আমি নিশ্চিত আপনাদের ইচ্ছে পূরণ করতে পারব এবং হাতের পুতুল হয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করে সকল কথা মেনে চলতেপারব। আপনারা তখন আমাকে দিয়ে আপন ইচ্ছের পূরণ ঘটাতে পারবেন এবং তাতেই আমার ভাগ্য আরও খুলে যাবে। অনেক দারে ঘুরে প্রোমোটারদের কাছে আমি কেবলই কু প্রস্তাবই পেয়েছি। তাই আপনাদের এখানে এসেছি এই ভেবে যে ভাগ্য যদি কু পথ অবলম্বন করেই ডাকে খ্যাতির দিকে তবে আপনাদের মতো মহা খ্যাতিমান কাছে যাওয়াটাই ভালো তাতে ভাগ্য একটু বেশীই সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস করি। ...'

এরপর আর তাকে প্রশ্ন করা ইচ্ছে চলে গিয়েছিল সূচিত্রার, সে তক্ষুনি সুবর্ণাকে চিৎকার দিয়ে ডেকে এনে বলেছিল, 'এই বাজে মেয়েটাকে এখনি এখান থেকে বের করে দাও।'

ওটাই শেষ। আর কাউকে কল করা হয়নি এর পর দিন থেকে। রাতেই মোবাইল কোম্পানীতে ফোন করে অটো মেসেজিং টা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছিল সুবর্ণা।

ওর চেয়ে বেশী আর সত্য শোনার সাহস পায়নি ঐ তিন খ্যাতিমান। তবে তারা অতটুকুতেই বুঝেছিল তাদের খ্যাতি যেমন আকাশচুম্বি , জনগণের মনে তেমনি তাদের প্রতি স্থায়ী হীনতার পরিমাণ আরও উঁচু।

শ্রা ব ণ ধা রা য়

কিছু একটা লিখতে হবে। কি লিখতে হবে জানিনা। প্রবল চাপ অনুভূত হচ্ছে।

যে কোন রকম চাপের পেছনেই অনকেগুলো কারন থাকে। যেমন নিম্ন চাপ (পায়ু পথের দিকে), বায়ুচাপ, বৃত্তের চাপ, উর্ধ্বচাপ, চাপাচাপি --এ সব চাপের পেছনে কারন কি আছে আমরা জানি হয়তো, না জানলে আর জানবোনা এখন। তো সেই কিছু একটা লেখার চাপ এর পেছনে মনের অস্থিরতা কাজ করেছে। অস্থিরতার পেছনে আবার কিছু কষ্ট, কিছু দুঃখবোধ এবং কিছু অনাহুত আনন্দ। কিছু কষ্ট, কিছু দুঃখবোধ এবং কিছু অনাহুত আনন্দের পেছনে আবার ...থাক ...। কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সের চাপের সূত্রে আছে দেহের অভ্যন্তরের বায়ুর চাপ বাইরের চাপের বেশী বা কম, আনব্যলেন্সড হলে আমাদের এই এত গর্বের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। চেতনায়, মনে মননে সেই চাপের তারতম্য , লেখার ইচ্ছে আর তার বাহ্যিক প্রকাশের চাপে তারতম্য। ভার্চুয়াল চাপ তাই ভার্চুয়ালী চূর্ণ বির্চুণ্ হচ্ছি, দেখছে না কেউ। কি সব আবল তাবল বলে জায়গা ভরাচ্ছি! এক সেকন্ড, ভাবি.....

ভাবনার কিছু নেই , ওই তো চোখের সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছে যে মেয়েটা মনের পথে ওকে টেনে নিয়ে আসি...

মেয়েটার নাম শ্রাবনী না হলেও এখন শ্রাবন মাস, তাই শ্রাবনী বলে ডাকব। কার্জন হল থেকে হেঁটে হেঁটে বের হচ্ছে । কাঞ্চন ফুলের শুভ্র পরশ ওর ওড়না ছুয়ে গেল। আকাশে উড়ে উড়ে আসছে কালে কালো মেঘ।

এই রিকশা যাবে কলাবাগান, পরপর দুটো রিকশাওয়ালাকে বলল, দুজনেই না সূচক মাথা নাড়াল । মেঘ বৃষ্টির দু'এক ফোঁটা আদর ছুড়ে মারতে শুরু করেছে। ফোঁটা ফোঁটা আদর খুব একটা সমস্যা হচ্ছেনা শ্রাবনীর । ভালই লাগছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়া শুরু হলে সমস্যা হয়ে যাবে। অত আগ্রাসী আদর এই মুহূর্তে ভাল লাগবেনা। তার আগেই একটা রিকশা পাওয়া দরকার।

মেঘ মনে হয় মনের কথা বুঝতে পারল আর তাই ভীষন জোড়ে হেসে উঠল আর সে বজ্রধ্বনীর সাথে সাথে নেমে এল ঝমঝম বৃষ্টি । দৌড়ে গেটের ভিতরে চলে এল শ্রাবনী। আশ্রয় নিল পাশের বিল্ডিংটার সেডের নিচে। বৃষ্টি বাড়ছে। শ্রাবনের এ ভরদুপুরে বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা গুলো ছুটে ছুটে আসছে শ্রাবন্তীর দিকে। সিঁড়িতে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শ্রাবন্তীর সেলোয়ারের যতটুকু আয়ত্বে পাওয়া যায়। ওর পেছনে বসে

আছে ভাবান্তর হীন এক প্রেমিক যুগল। আর দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে ওর মত আশ্রয় নিয়েছে , নিজেদের বাচাচ্ছে বৃষ্টির অনাহুত আদরের পরশ হতে। পরিচিত কাউকে দেখা গেলনা। বিরক্তিকর অপেক্ষা কখন বৃষ্টি থামবে। কোন রিকশা আর গেটে দেখা যাচ্ছেনা।

ঠিক একই সময় টিএসসিতে আড্ডা দিচ্ছে তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তারমধ্যে দুটি ছেলে শ্রাবনীর সাথে পড়ে কেমিষ্ট্রিতে। নয়ন আর আবীর। মেয়েটাও ভার্সিটিতেই পড়ে। জুনিয়র । সম্ভবত বোটানীতে পড়ে। সম্ভবত বলছি এই কারণে মেয়েটির সম্পর্কে না জানলেও চলবে।মেয়েটা আবীরের ফিয়ান্সী। মিতুল। অন্য যে ছেলেটা ওদের সাথে, সে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েনা। পড়ে বুয়েটে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং, শেষ বর্ষ। আবীর আর নয়নের বন্ধু। ছেলেটির নাম দিলাম প্রতীক। নয়ন এর মোবাইলটি এই মুহুর্তে আবীরের হাতে।

নয়নের দামী মোবাইল সেটটা গুতোগুতি করতে করতে শ্রাবনীর নম্বরটায় চোখ আটকে গেল।

ঃকেরে নয়ন এই শ্রাবণী। বেশ সুন্দর নাম তো।

ঃপ্রতীক না তোর এই বদ অভ্যাস গেলোনা। অন্যেও মোবাইলে ঢু মারিস কেন। এই জন্য মোবাইল কারও হাতে দেয়া উচিৎ না।

বলেই নয়ন মোবাইল ছিনিয়ে নিল।

ঃ ও তার মানে ডাল মে কুস কালা কালা।

আবীর আর মিতুল শুনছিল। বলল আরে নারে নয়নকে পাত্তা দেবার মত মেয়েনা। আমাদের ক্লাশমেট। পুরো ক্লাশের মধ্যে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট।

মিতুল বলল,প্রতীক ভাইয়া করবেন নাকি প্রেম । দেখতে কিন্তু ফাটাফাটি। নয়ন ভাই দিয়ে দেন নম্বরটা ।

ঃ আরে না। তুমি জাননা, প্রতীকের মেয়েদের সাথে ফ্লাট.....

ঃ চুপ। দেখ মিতুল তোমার বিশ্বাস হয় । আমি এমন ছেলে।

ঃ আর ও মেয়ে ছেলেদের কে খুব একটা পাত্তা টাত্তা দেয়না। পড়াশোনা ওর কাছে মুখ্য।

মিতুল বলল, কেন প্রতীক ভাইয়া কি কম ব্রিলিয়ান্ট।

আবীর বলল, ওকে তাহলে দেখা যাক প্রতীক পারে কিনা কিনা পটাতে।

ঃকি শুরু করলি তোরা বলত, মিতুল এই সুন্দর বৃষ্টিতে একটা গান গাওতো বলে নয়ন কথা অন্য দিকে নিতে চেষ্টা করল।

প্রতীক কিন্তু মনে মনে চাচ্ছে শ্রাবণীর সাথে সখ্যতা। বলেই ফেলল, ওকে আবীর আমি চ্যালেঞ্জ নিলাম। দে নম্বরর দে।

নয়ন দেবেই না। শেষ মেষ আবীর মোবাইল বের করে দিল।

ঃআবীর দিস না । শ্রাবনী জানলে কি ভাববে।

প্রতীক বলে উঠল, ভয় নেই বন্ধু , এই যে মিতুল ভাবীকে স্বাক্ষী রেখে বলছি জীবনেও জানবেনা। ওকে।

আমি কিন্তু কিছু জানিনা। বলেই নয়ন হন হন করে সিগারেট আনতে চলে গেল । প্রেমিক যুগল বসল বৃষ্টির ধারায় প্রেম ধারা দেখতে। প্রতীক একটু দূরে সরেই মোবাইলে শ্রাবণীর নম্বরটা সেভ করেই মিস কল দিল।

বৃষ্টি কমছেই না। কাধের ব্যাগটা পানির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে অনেকটাই বৃষ্টিতে ভিজছে গায়ের কাপড়। হালকা দমকা হাওয়া বইছে বৃষ্টির সাথে সাথে । সবুজ পাতাগুলোর নৃত্য শ্রাবনীকে মুগ্ধও করছে। কিন্তু বিরক্তি লাগছে, বাসায় যাবার তাড়া। কাজ আছে অনেক বাসায়।

হঠাৎ ব্যাগের ভিতরের মোবাইর নামক জন্তুটা নড়ে উঠল। বের করে মিস কল কার দেখতে দেখতে আবার বাজল। এবার থামলনা। রিসিভ করল।

ঃকে।

ঃ কেমন আছেন শ্রাবনী।

ঃ কে চিনলাম না তো। একটু আগের মিস কল টা কি আপনি দিয়েছিলেন।

ঃ হু।

ঃ তো কে বলেন।

ঃ আসলে আপনি আমাকে চিনবেন না।

ঃ মানে

ঃ আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। বন্ধু হবেন।

মোবাইলে এমন ফোন ওর প্রতিনিয়তই আসে । সুন্দর করে বকাঝকা দিয়ে রেখে দিতেই তখন শ্রাবণীর মজা লাগে। খাতির তাও অচেনা কোন বান্দর এর সাথে, ইচ্ছেই হয়নি। কিন্তু আজ কেন জানি বকলও না। ফোন ও রাখলনা। হয়তো বিরক্তি কর বৃষ্টি থামার অপেক্ষা বাধ সাধল।বলল

ঃকেন. আমাকে চেনেন।

ঃ না । তাইতো চিনতে চাই।

ঃ ভাল । চিনে কি হবে।

ঃ ফ্রেন্ডশীপ।

ঃ এত সহজ। চিনিনা, জানিনা। বললেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

ঃ চিনব, জানব তার পর হবে।

ঃ সরি , আমি অচেনা কারও সাথে কথা বলিনা। আর বন্ধুত্ব, ইমপোসিবল। রাখছি। আর করবেন না।

এবার রেখে দিল শ্রাবণী। প্রতীক হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কিছুক্ষণ যখন কথা বলেছে আরও বলবে। আবার ফোন করল।

ঃ কি ব্যপার আবার করলেন কেন।

ঃ না, আপনার জানার ইচ্ছে হলোনা। আমি কে। আপনার নাম কি করে জানলাম।

ঃ শোনেন, আমি জানতে চাইলেই মনে হয় আপনি বলবেন? শুধু শুধু মিথ্যে শুনে লাভ কি। যে কেউ দিতে পারে। আর আপনি পেয়েই ফোন করে ফেললেন। আপনাদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

ঃ এই বৃষ্টি র মধ্যে কি করব বলেন তো। বন্ধুর মোবাইলে শ্রাবণী নামটা দেখে পছন্দ হলো । আটকে পড়ে আছি টিএসসিতে , ভাবলাম শ্রাবনী নামের কেউ বন্ধু হলে ভালই হয়। নম্বরটা মেরে দিলাম।

ঃ বাহ। সুন্দর গল্প। তা সে কে যে আপনার কাছে নম্বর চুরি করার জন্য মোবাইল দিয়ে চলে গেছে। বানিয়ে একটা নাম বলে ফেলেন।

ঃ নাহ মিথ্যে কেন বলব। মিথ্যে বলতে পারবনা বলেই তো নামটা বলছিনা।

ঃ ওহ আচ্ছা।

ঃ আপনি কোথায় জানতে পারি।

ঃ না পারেননা। যে দিয়েছে নম্বর তার কাছে জিজ্ঞেস করেন। বৃষ্টি কমে আসেছে। আমি রিকশায় উঠব। আর কল করবেন না মিঃ..

ঃ প্রতীক।

ঃ যা হোক। ওকে।

ঃ শোনেন শোনেন শ্রাবণী, রাখবেন না। আপনি কি ভার্সিটিতে।

ঃ যেখানেই থাকি। আপনার কি।

ঃ বৃষ্টি র শব্দ পাচ্ছি । বলেন না কোথায় , চলে আসি।

ঃ কি আশ্চর্য। আপনি ফোন রাখুন। আই রিকশা যাবা।

ঃ এই বৃষ্টি তে কেউ যাবেনা। তার চেয়ে আমার সাথে গল্প করতে থাকুন। সময় কাটবে ভাল। আর যদি বলেন তো চলে আসি।

ঃ আসবেন। আমি কই তাই তো জানেননা মিঃ প্রবীর।

ঃ হু, হু। প্রতীক।

ঃ আমি যদি এখন মিরপুর গোল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকি তাও আসবেন।

ঃ বলেই দেখেন। তবে মনে হয় আপনি কার্জন হলে। আপনাদের ক্লাশ শেষ হয়েছে আধাঘন্টা ও হয়নি। আপনি একটু দেরিতে বের হন।

শেষ কথাটুকু নয়ন এসে কানেকানে বলে গেল তাই বলতে পারল প্রতীক আরও বলল এইবার ধরা খাবিরে সব মেয়ে একনা।

ঃ ও সবই তো জানেন। তাহলে তো জানেনই কোথায় আছি।

ঃ কার্জন হলের গেটে।

ঃ কেন বলব। অবশ্য এ বৃষ্টি তে আসতেও পারবেননা। টিএসসির গেটে নিশ্চয় আপনার জন্য রিকশা দাঁড়িয়ে নেই। নাকি ভিজেই আসবেন।

ঃ শুধু আসতে বলেই দেখুন।

ঃ আচ্ছা আপনার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছেনা অবশ্য আপনি খুবএকটা খারাপ মানুষ। মেয়েদের ডিস্ট্রাব করেন কেন? আপনি কি করেন বলেনতো।

ঃ যাক কথা বলতে রাজী হয়েছেন তাহলে।

ঃ নো মিষ্টার । যতটুকু বলেছি খালি বৃষ্টি র বদৌলতেই। এবার রাখি। দেখুন মিষ্টি করে বলছি আর বিরক্ত করবেননা। আপনি ভদ্র বলেই ভাল করে বললাম। না হলে এ পৃথিবী ভাল কথার দুনিয়া না।

ঃ আমি বুয়েটে পড়ি। আপনি ওয়েট করেন আমি আসছি।সত্যি।

ঃ আরে পাগল নাকি।

ঃ ওয়েট।

ফোন কেটে দিল প্রতীক। প্রতীকের কেন জানি হঠাৎ মনে হল আজকের এই বৃষ্টি শুধু ওর জন্যই। শ্রাবনীই ওর সেই গোপন প্রণয়িনী। যাকে নিয়ে স্বপ্নে এত মধুর ঘোরাফেরা। নয়ন কে ডাকল।

ঃকি। কথা শেষ। কি বললি এত। কয়টা গালি খেলি। না বকাঝোকা শুনতেও ভাল লাগল।

ঃ না। শুধু বল। কি রঙের ড্রেস পড়া।

মিতুল শুনে ছুটে এল পাশ থেকে, প্রতীক ভাইয়া । আপনি তো জিনিয়াস। আমি দেখেছি আপুকে সকালে। ময়ূরকণ্ঠী নীল রঙের কামিজ আর আকাশী সেলোয়ার। ওড়নাটা সাদার মধ্যে নীল কাজ করা। এই বৃষ্টিতে ভিজে যাবেন।

ইস আবীর যদি আপনার মত একটু রোমান্টিক হতনা। উইস উই গুডলাক ভাইয়া। মিষ্টি খাওয়াবেন কিন্তু।

নয়ন কিছু বলার আর ডাকার আগেই দৌড় দিল প্রতীক। কোন রিকশা নেই। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। সিগারেটের দোকান থেকে পলিথিনের একটা কাগজ নিল চেয়ে। মোবাইলটা আর মানিব্যাগটা তাতে পুরেই দৌড়। এক সেকেন্ড ও লাগলনা ভিজে জবজবে হতে।

দৌড়ে দৌড়েই পৌঁছে গেল দ্রুত দোয়েল চত্বরের কাছে। বর্ষা সিক্ত দু'চোখ খুঁজছে গেটের ভিতরে নীল কামিজের একটা সজীব নারীকে। চোখের চশমাটা ভিজে অস্পষ্ট হয়ে আছে। পানির আবরণ ভেদ করে সব দৃশ্য ঘোলা ঘোলা লাগছে। চশমাটা যে মুছবে, কোন শুকনো কাপড়ও নেই।

মাকে ফোন করে জানাল শ্রাবনী, আটকে আছে। মা বললেন সমস্যা নেই। একটু দেরীতে এলেও হবে। বৃষ্টিতে ভিজতে মানা করলেন। কিন্তু বিরক্ত লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওই ছেলেটার সাথে কথা বলতে তো ভালই লাগছিল। দেব নাকি একটা মিসকল। না থাক দাম বেড়ে যাবে। তবুও জীবনে প্রথম কেন জানি ইচ্ছের বিরুদ্ধে ফোনটা বরে করল। আর তখনই সামনে এসে দাঁড়াল প্রতীক ,বলল

ঃআপনি শ্রাবনী। আপনার কাছে একটা শুকনো রুমাল হবে। চশমাটা ঘোলা হয়ে আছে । একটু মুছব।

শ্রাবণী অবাক। ভীষণ অবাক। ছেলেটা ভিজে জবজবে। থর থর করে কাপছে। ওর নামও জানে। বলল,

ঃআপনি কে।

ঃআপনি শ্রাবণী তো।

ঃআপনি কে?

ঃআমি ? একটু আগে যার সাথে কথা বলছিলেন, ভুলে গেলেন?

ঃআপনি আমাকে চেনেন।

ঃনীল জামা আর কারও গায় নেই তাই ভাবলাম আপিনিই...

ঃআমি নীল জামা পড়া আপনি জানলেন কি করে?

ঃবলছি। একটু দাঁড়ানোর জায়গা দেবেন দয়া করে। আর একটু শুকনো কাপড়।

ঃআপনি তো রীতিমতো কাঁপছেন। আসুন। আপনি তো দেখছি পুরো পাগল।

প্রতীক জীবনে প্রথম বোকার মত হাসছে তো হাসছেই।

অন্য যে কোন সময় এরকম কোন ছেলে এসে উৎপাত করলে, তাও ভার্সিটি এরিয়ায়, হৈ চৈ ফেলে দিত। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটাতেই ইচ্ছে হলোনা শ্রাবনীর। নিজের ওড়নার শুকনো অংশ দিয়ে প্রতীকের চশমাটা মুছেও দিল।

প্রতীক রিকশার বদলে সি এনজি ঠিক করে দিল সেই না থামা বৃষ্টির মধ্যেই। শুধু কি তাই বাসা পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছিল। প্রতীকের পুরুষালী মন বৃষ্টি সিক্ত অধরে ছুতে চেয়েছিল শ্রাবনীর সুস্মিত অধরখানা নির্জন গল্পযাত্রায় দুজনার। নিরবে কবর দিয়েছিল সে ইচ্ছে। আজ হতে সে সত্যি ভালবাসার রাজ্যে ভাসবে। ভালবাসবে শ্রাবনীকে। সত্যিকারের ভালবাসা। শ্রাবণীর মনেও একই সুর বইতে দিচ্ছিল বিধাতা। দুজন ভাল বন্ধূ হয়ে গেল । সেদিন সে শ্রাবন ধারা সফরে।

ভালবাসা এর পর এগোচ্ছিল খুবই সুন্দর কাননে শুভ্র মেঘের ভেলায়। .....

এ গল্প আপাতত এখানেই শেষ করছি। আমার গল্পের নায়ক নায়িকা এরপর সুখে শান্তিতে আছে ধরে নিচ্ছি।

কখনও যদি আবার ওদের সাথে দেখা হয়ে যায় কোন পথে হয়তো আবার লিখব তখনকার কাহিনী তাদের একইভাবে।

ম ই সা ধ রা ম ন

অর্ণব নামেই আমি পরিচিত। অত্যন্ত ভ্রমনবিলাসী হতে পেরেছি কিনা জানিনা তবে সেরূপেই ভাবি নিজেকে।

আমি যেন এক যাযাবর। অবসর পেলেই ঘুরে বেড়াই। মন যেখানে যেতে চায়, বাধা নেই, সেখানেই যেন আমার ভ্রমন।

পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। আপাতত ক্যাম্পাসের আড্ডা শেষ। আর ও আড্ডার উজ্জল প্রতিফলনে আমি তো সদাই ম্রিয়মান। থাকলেইবা কি হতো আর।

সব কিছু থেমে যেতেই তো আসলে অবসর এল আর সুপ্ত মন জেগে উঠল ভ্রমনের দূর্ণিবার নেশা। যা ভাবা সেই কাজ। পরদিন সকালে ভৈরব বাজাররের ট্রেনের উদ্দেশ্যে পৌঁছালাম কমলাপুর ষ্টেশনে সাথে আমার সঙ্গী বহুদিনে পুরনো চামড়ার একহাতি ব্যাগখানা।

কমলাপুর রেল ষ্টেশনে আসলে, বিশেষ করে এই ভোরবলো যে লোকগুলোকে যত্রতত্র শুয়ে থাকতে দেখো যায়, তারাই যেন পৃথিবী নামক কাহিনী ভান্ডারের মূল গতি সঞ্চালক। সুরম্য অট্টালিকায় চোখ ধাঁধানো বৈভবে আরম্বর পালঙ্কে শুয়ে গনতন্দ্রের নির্যাস আত্ত্বস্তকারিরা ভুল গল্প রচে রচে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে না পারলেও প্রকৃতির উদাম বিস্তৃতিতে এদের নিশ্চিন্ত ঘুম ঠিকই হয় বলেই আমার ধারনা। এবং ধারনা আসলেই ভুল না। এদেও নেই কোন নিরাপত্তার ভাবনা বা ধার ধারার ব্যাপার স্যাপার। নেইে এদের বিত্তের প্রচন্ড প্রচন্ড রকম দূর্বিষহ চাপ। আসলে সমাজের কোন ভাবনাই বুঝি এদের সমস্যায় ফেলায় না। এদের শুধু একই ভাবনা- ক্ষুধার্ত পেট, যার পূজোতে ঘুম থেকে উঠেই এরা দৌড়াতে শুরু করবে আর কেবল দৌড়াতেই থাকবে নিগৃহীত বেশে অত্যন্ত বিভেদী একপেশী, চেনা কিন্তু অবোধ্য এই সমাজে।

এসব ভাবতে ভাবতে ঠিকই পেট পূজোর যুদ্ধ হতে মুক্ত আমি টিকেট কেটে সময় মতো ট্রেনে চড়লাম। ট্রেনের ইঞ্জিনের ঘটাং ঘটাং শব্দকে সাদরে বরণ করে নিতে নিতে এক সময় পৌঁছে গেলাম ভৈরব জংশনে এবং সেখান থেকে রিকশায় মেঘনা তীরে অর্পূর্ব নিসর্গ আমেজে ঘেরা সবুজ মায়ায় জড়ানো ছোট খালার ছিমছাম কুটিরে।

অজানা সাগরের দিকে বয়ে চলা মেঘনার জলের গতি আর হিমেল হাওয়ায় ভ্রমনের মাঝে খুঁজে পেলাম সজীব উদ্যম। কিন্তু পথিকের কি আর এক জায়গায় বসে

থাকলে চলে। মাত্র একদিন যেতে না যেতেই ভীষন উদ্যমে খালার মনটাও খারাপ করে দিয়ে চট্রগ্রাম যাব বলে মন স্থির করে নিলাম।

যা ভাবলাম তাই। পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনের টিকিটও কাটা হয়ে গেলো। খালার অকৃত্রিম অনুরোধ উপেক্ষা করে যথাসময়ে উপস্তিত হলাম ভৈরব ষ্টেশনে আবারও। এসইে শুনলাম ঢাকা থেকে ট্রেন দেরী করে ছেড়েছে। অপেক্ষা করতেই হবে। খালার বাসায় যাব একবার ভাবলাম, কিন্তু পাছে যদি ট্রেন চলে আসে আর মিস করে বসি!

বিশাল জংশনের প্লাটফর্মের একপাশে নিরিবিলি একটা বেঞ্চেই আসিন হলাম। আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। অপেক্ষার সাথে ক্ষনিকের বন্ধুত্ব গড়ার চেষ্টা শুরু হলো।

সহযাত্রী হবে যারা মনে হচ্ছিল তাদের অনেককেই চলে যেতে দেখলাম। হয়তো আশেপাশেই বাড়ী। মোটামুটি নির্জন হয়ে গেলে একটু আগের জনাকীর্ণ প্লাটফর্মটা। সূর্য মামার তেজও কমে আসছে প্রবল বেগে।

ঘুম যেন আগ্রাসী হয়ে আগ বাড়িয়ে সঙ্গ দিতে চাইলো।

...হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশের ছোট একটা কামরায়। বসে আছি জানালার পাশে। জানালার বাইরে ঠিক নাক বরাবর একটা সবুজ গাছ। গোলাকার হয়ে ঝাকড়া হয়ে আছে। অন্ধকারেও স্পষ্ট ভাবে চেনা গেলো বকুল গাছের পাতাগুলোর ঘন সন্নিবেশ। ফুলেরও অপূর্ব গন্ধ ভেসে এলা নাকে। গাছের লম্বা ডালটিতে বসে একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্ ঠক্ করে ঠোকরাচ্ছে আর বিলোচ্ছে দৃষ্টিতে সোনালী বর্ণের আনন্দ তার অপূর্ব সুন্দর সোনালী পালক হতে। আকাশে হালকা মেঘ মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলছে জ্যোৎস্না ছাড়ানো চাঁদের সাথেও। সত্যিই ভীষন মায়াবী আবহ। খুব ভাল বোধ হতে লাগল মনে প্রাণে।

মুখটা ঘোরাতেই দেখতে পেলাম আমার সামনের সিটে মুখোমুখি বসে একজন হাসছে অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে। বেশ চেনাচেনা মুখ, তুবও চিনতে পারলাম না কিছুতেই। আমি মুখ খোলার আগেই সেই বলে উঠল, কি ওমন করে কি দেখছিস। চিনতে পারছিস না?

সত্যিই আমি আপনাকে চিনতে পারছিনা।

মনে মনে ভাবলাম, আমাকে তুই করে বলছে, ঘনিষ্ঠ কেউ ই তো হবার কথা, চিনতে পারছিনা কেন?

আবারও সে বলে উঠল, তুই করে বলছি কেন ,ভাবছিস , না? ভাবতে থাক। চিনতে পারলেই দেখবি তুইও ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে থাকবি।

কি আশ্চর্য, মনের কথাও বুঝে ফেলছো। তা তুমি যেই হও , এখানে এই কামরায় ঢুকলে কখন। দেখলাম না কেন ঢুকতে? অথবা শুনলাম না কেনো শব্দ?

তোর সব প্রশ্নেরই উত্তর দেবো। কেন দেবোনা? একমাত্র তুই ই তো আমার সব কথা মন দিয়ে শুনিস। তুই ই যে আমার সব চেয়ে কাছের। তোর সব মতাদর্শ , চিন্তা

চেতনা , সব যে আমার জানা রে। আমি এসেছি তোর সাথে সাথেই। টের পাবি কি করে। বাইরের পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ায় ডুবে ছিলি যে। তোর মতো প্রকৃতি প্রেমিক এই কল্প জগতে একবার ঢু মারতে শুরু করলে কি আর কোন খেয়াল থাকে রে। কথা বলতে বলতে একসময় ঠিকই চিনবি রে আমাকে অর্ণব। দেখেছিস চাঁদের চারপাশ ঘিরে কি সুন্দর তারার হাট বসেছে। শুধু প্রকৃতিই নয় আজ রাতে পুরো জগতটাই অন্যরকম। অনেকটা তোর স্বপ্নের জগতের মতো। আজ রাতে কোথাও কেউ ক্ষুধার্ত নয়। কমলাপুর ষ্টেশনে খেয়ে বা না খেয়ে কেউ শুয়ে নেই। আজ রাতে পথে নেমেছে গন্তন্ত্রের ধ্বজাধারী, টাকায় আচ্ছাদিত যত জ্ঞানীর দল। তার উপলব্ধি করেতে শুর করেছে তোর ইচ্ছে।

মিথ্যে কথার আর জায়গা পাওনা, না। সব বানিয়ে বলছ আমাকে খুশি করার জন্যে।

হতে পারে। কারন আমিই একমাত্র জানি তোর খুশি কিসে। তোর সাথে আমার এত টাই সময় কেটেছে যে না জেনে উপায় নেই। সব জানি তোর।

কিন্তু তাহলে আমি তোমাকে চিনতে পারছিনা কেনো?

আজ যে চারপাশে প্রচন্ড আনন্দ। চিনতে পারবি। এইতো সবে আপনি থেকে তুমি বলছিস। একটু পরে তুইতেও নামবি। আচ্ছা তোর মনে পড়ে ঢাকায় একবার তুই রমনা পার্কে একা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলি। হঠাৎ একটা ছোট মেয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তোর কাছে এল। তার গায়ে একটুকরো ছেড়া কাপড়। ত্যানাই বলা চলে। আর কিছু ছিলনা তার বেশী। মেয়েটা বলল, 'সাব আমি কালকের তোন কিছু খাইনাই। আমারে দুইটা টাহা দিবেন।' তুই তাকে হোটেলে নিয়ে পেট পুরে খাইয়েছিলি। কিনে দিয়েছিলি নতুন কাপড়। তোর মনে পড়েনা সেদিন মেয়েটা যেন জীবনে প্রথম হেসেছিল খুশি মনে। এই নিয়ম সর্বস্ব সমাজে দারিদ্র, ক্লীষ্ঠ শিশুটি চলে যাবার সময় বলেছিল, 'ফেরেশতা কেমুন জানিনা, তয় আপনে হেইরকম কিছু একখান। আপনি এই দুনিয়ার না সাব।'

তুই কোন কথা বলতে পারিসনি,ত কেবল তার চলে যাওয়া দেখেছিলি। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে মেয়েটা যদি জানত তুই সেই মানুষটাই, ফেরেশতা টেরেশতা কিছু নয় যে কিনা একটা বইয়ের পৃষ্টা ছেড়ার অপরাধে বাড়ীর কাজের ছেলেটার মুখে পাঁচ আঙ্গুলের মানচিত্র এঁকে দিয়েছিলি। বন্ধ করে দিয়েছিলি পাগলা রাগে তার এক বেলার খাবার। জানতে ইচেছ করে খুব মেয়েটা সে ঘটনা জানালে কি বলত তোকে?

আমিও জানিনা। সমাজের কাদায় পা ডুবিয়ে হাঁটতে অভ্যস্ত আমি এবং বাধ্য। আর কোন পথ যে নাই। এক ফোঁটা করে পানি ফেলতে থাকলে একসময় বড় কলস ও ভরে যাবে। সমাজ আমার শূন্য পৃথিবীর কিংদাংশ তো আপন উপাদানে ভরাবেই। এই তো সেদিন আমার এক বন্ধু সৌমিককে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। গেইটটম্যানকে বাধ্য হয়ে দশ টাকা দিতেই হলো। না হলে প্রবেশ হয়ে যেত রুদ্ধ। ঘুষ এসব ক্ষেত্রে নিয়মের চেয়েও বড় নিয়ম। টেলিফোন নষ্ট । ঠিক আর হয়ই না। বাসার

বড় ছেলে বাধ্য হয়ে অত্যন্ত নিপুণ অভিনয় পারদর্শী হয়ে লাইনম্যানের হাতে গুঁজে দিলাম ২০০ টাকা। এক ঘন্টার আগেই ঠিক। আর ও আছে। বাসার কারেন্টের মিটার রিডার একজন এসে দেখার সময় সীল ছিড়ে ফেলল। পুনরায় সীল লাগানোর নামে নিয়েও নিল কিছু টাকা। ওদিকে কদিন পরে আরেকজন ইনেসপেক্টর এসে ধরল, বলল টেম্পারিং করা। টাকা নিল দুজনেই। টাকা দিতেই টেমপারিং শুদ্ধ হয়ে গেলো। সত্যিই টাকার কত ক্ষমতা। অশুদ্ধ শুদ্ধ হয়ে যায় আর শুদ্ধ অশুদ্ধ।

ওসব তোর ঘটনা সব আমি জানি। আমি জানি বান্ধবীকে সাথে সিনেমা দেখতে গিয়ে মাত্র ১০ টাকা লাইটম্যানকে দিয়েছিলি একটু পেছনের দিকে বসার জন্যই তো। আবার সেই তুইইতো ঝগড়া বাধিয়েছিলি জিপিওতে রেজিষ্টার চিঠি পাঠানোর লাইনে দাঁড়িয়ে। লাইনের সামনের অংশ কি অদ্ভুত কারনে সরছিলই না। আজব। মনে পরে শেষে পরাজিত সৈনিকের বেশে চলে এসেছিলি বাইরে।

আচ্ছা ট্রেন কি ছেড়েছে। বকুল গাছটি আর দেখা যাচ্ছেনা কেনো? ছেড়েছে মনে হচ্ছে, তাইনা। তোমাকে চিনতে না পারলেও ভালো হলো কথা বলে ভালই সময় কেটে যাচ্ছে।

ভাল তো লাগবেই আমিই যে তোর একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু।

হঠাৎ কামরার দরজার দিক থেকে শব্দ কানে এলো। দরজা খোলার শব্দ। ওদিকে তাকাতেই দেখাগেলো একটা মেয়ে ঢুকছে আমাদের মানে আমার কামরায়। গায়ে মিষ্টি কোন সুগন্ধি মেখেছে মনে হয়। ভীষন কড়া। তাহলে কি হবে গন্ধ টা কিন্তু বেশ মধূর। তার লম্বাটে শ্যামলা মুখ। দীঘল খোলা চুল পচে পড়ছে পিঠের উপর।

আমি কি আপনার পাশের সিটে বসতে পারি। অনুমতি প্রাপ্তির তোয়াক্কা না করেই শুধু বলেই সে বসে পড়ল আমার পাশের সিটে।

দেখেই তুই বলতে থাকা বন্ধুটি হেসে উঠল মুচকি মুচকি।

মেয়েটা বলে উঠল আবার, আমার সিট ছিল পাশের কামরায়। কিন্তু ওখানের অন্য তিনজন মানুষকে কেমন জান সুবিধার মনে হচ্ছিলনা। ভয় ভয় লাগছিল। একা একা ওদের সাথে এই দীর্ঘ জার্নিতে থাকতে পারবনা।

হাত দিয়ে লাগেজটা সীটের নিচে চালান করে দিল মেয়েটা তার কোমল হাতে, তারপর অনেকক্ষণ নিরবতা।

এই যে ম্যাডাম, আপনার কি আমাকে দেখে একটুও ভয় লাগছেনা। আমাকে কি মনে হচ্ছেনা, অসুবিধাজনক কোন টিপিক্যাল পুরুষ। মনে কি হচ্ছেনা, এই ঘরে আপনার জন্য আরও বেশী ভংকর কোন ঘটনা অপেক্ষা করে আছে।

সত্যি বলতে কি আপনাকে দেখে আমার অত্যন্ত আত্মনৈতিক বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বললে আসলে ভুল বলা হবে। বিশ্বাস হচ্ছে আত্মাকে অনৈতিকতায় দেখতে ভয় পান আপনি। আপনাকে তাই আর কি ভয় পাব।

শুধ আমাকে সম্বোধন করছেন কেনো? এই ঘরের আরও একজন সম্মানিয় যাত্রী আছেন। আপনাদের বলে সম্বোধ করুন। যদিও তাকে আমি এখনও চিনতে পারিনি। তবে সে যে অকৃত্রিম বন্ধু প্রমান পেয়েছি। আপনাদের বলে সম্বোধন করুন। উনি আবার মাউন্ড করতে পারেন। উনি খুবই নীতিকথার মানুষ।

আসলে আমি দুজন কে একত্রে সিংগুলার করে আপনি বলেছি। আপনারা দুজন আসলে কিন্তু একই।

কি বললেন?

না, কিছু না। আপনার অসবিধা সৃষ্টির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত অর্ণব সাহেব। আমার মনে হয়না আমার উপস্থিতি আপনাকে বিব্রত বা বিতস্ত করবে।

আপনিও আমার নাম জানেন! কি ব্যাপার আমি কি এতই বিখ্যাত কোন মানুষ নাকি? স্টেশনে ঢোকার সময় খোড়া ভিক্ষুকটাকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম আর সে দোয়া করেছিল,' বাবা , অনেক বড় হইবা, অনেক নাম হইব তোমার।' দোয়া এত দ্রুত ফলে গেলো। কি আশ্চর্য। এতদ্রুত বিখ্যাত হয়ে গেলাম নাকি।

হঠাৎ তীব্র শীতল বাতাস আসতে লাগল জানালা দিয়ে। সেই সাথে নাকে এল আবার বকুল ফুলের গন্ধ। জানালার ওপাশে দৃষ্টিটাকে সযতনে নিক্ষেপ করতেই দেখি সেই বকুল গাছটা ঠায় দাঁড়িয়ে। গাছে এখন একটা নীলকণ্ঠি পাখীও এসে বসেছে। চাদোয়ায় তার গায়ের নীল রং অত্যধিক মুগ্ধরূপে উজ্বল হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য ট্রেন তো চলতে শুর করেছে অনেক আগেই। পেছেনের দৃশ্য কিভাবে ফিরে এলা আবার?

কিরে, বন্ধু , ওত ভাবছিস কেনো? ট্রেন ঠিকই চলছে। আজ যে তোর কল্পনায় উন্মোচিত হবার সময়। তোর প্রকৃতি বিলাসী মনে সব কিছুই চলছে তোর সাথে। দেখ নীলকণ্ঠি পাখিটার দেহ হতে কি অপূর্ব নীল জ্যোতি ছড়াচ্ছে চারপাাশে। যেন একটা নীল সূর্য। কি অপূর্ব।

ওটা যে নীল কণ্ঠি পাখি তাও তুই জানিস।

জানবনা কেনো? তুই তো শিখিয়েছিলি।

তাই নাকি?

তোর মনে পড়ে গত বছর বোটনিক্যালের ঘটনা। তুই পাখি আর গাছ দেখতে ছুটেছিলি। সঙ্গে আমি ছিলাম। অনেকক্ষন ঘোরা পর এক গাছের নিচে বসে বিশ্রামের উপায় হিসেবে বই খুলে মেলে ধরতে যাচ্ছিলি সবে চোখের সামনে। হঠাৎ দেখলি সামনে দিয়ে এক জোড়া যুবক যুবতী হেঁটে গিয়ে কাছের এক ছাউনিতে গিয়ে বসল। ওটা ছিল খাবার দোকানের ছাউনি। হালকা কিছু নাস্তা তারা খেয়েছিল । তারপর যখন তাদের সামনে বিল দেয়া হলো তুই দূর হতে শুনলি ভীষন চ্যাচাম্যাচি। শুনে বুঝলি বিল ছিল হাজার টাকার উপর। ছেলেটার কাছে ওত টাকা ছিলনা। তাই কি আর করা। সাথে আবার সুন্দরী প্রেমিকা। বাধ্য হয়ে বাটপার দোকানদারদের দ্বারা ভদ্র পন্থায় ছিনতাইয়ের স্বীকার হলো , দিয়ে দিল হাতের ক্যামেরাটা। তুই উঠে দাঁড়িয়েছিলি। কিছু

বলার সাহস পাসনি। অন্যদিকে ঘুরে ভীতু কাপুরুষের মতো হাঁটতে শুরু করেছিলি অজানা শংকায়।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি তো তখন সাথে ছিলেনা। একাই পালাচ্ছিলাম। পালাচ্ছিলাম নিজের কাছ থেকে।

পালাতে কি পেরেছিলি? নিজের কাছ থেকে পালানো যায়না বন্ধু। তাইতো আমি সব সময়ই থাকব সাথে।

মেয়েটার দিকে চোখ গেলো। আড়চোখে মিষ্টি হাসছে আর হাতে একটা পত্রিকা খুলে বসে আছে। কোথায় যেন দেখেছি এই হাসি। হ্যাঁ দেখেছিই তো। এবার খুব চেনা লাগছে। এতো সেই চেনা আড় চাহুনী।

বন্ধু আরে চিনছিস না কেন, ওতো সেই মেয়টাই যে তোর বাসার উল্টোপাশের ...

...হঠাৎ কে যেন ধাক্কা মারল কাঁধে। বলে উঠল , কানে বাজল, ' ওঠেন ভাই , ওঠেন, ট্রেন তো চলে এসছে।'

একিদ ওদিক তাকাতে লাগলাম। চোখ রগরাতে রাগরাতে দেখলাম ট্রেন ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চারদিকে অনেক লোক এখন। কিন্তু আমার ব্যাগটা? পাশেই তো ছিল। নেই তো নেই। চারদিকে চোখ মেলে মন খুঁজে বার করতে চাইল ব্যাগের অস্তিত্ব। চোখে পড়ল। তবে যার হাতে সে ততক্ষণে ষ্টেশনের বাইরে যাবার গেটের কাছে পেঁছে গেছে। ট্রেনও ছাড়ার জন্য হুইসেল দিচ্ছে। বুঝলাম ওদিকে দৌড় দিলে ট্রেন মিস হবেই। লোকটা অদৃশ্য হবার আগে তার রুক্ষ মুখটা ঘোরালো এদিকে একবার ক্রুর হাসিতে সত্যিই অভাবের ছাপ। তথাকথিত বিত্তবান চোরদের মত প্রচ্ছন্ন ভাব দেখা গেলোনা সেখানে। আরে ঐ লোকটাই একটু আগে ডেকে দিল ঘুম হতে। মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল,'বন্ধু , কি আজব না! এই মানুষের মধ্যে একউ সাথে স্বর্গ আর নরক, কি আশ্চর্য !'

ভাবলাম মনে মনে নিজেও তো তাই, কখনও কারও মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছি আবার তুলে দিচ্ছি অন্য কারও মুখে কখনও।

মইসা ধরেছে যেন অযত্নে অবহেলায় মনের দেয়ালে, জমিনে সর্বত্র।

এ ই না হ লে মা নু ষ

(এই গল্পটি একটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।
গল্পটিতে আলীর কথাগুলো ব্যক্ত হয়েছে সাতক্ষীরার আঞ্চলিক ভাষায়)

বয়স আর কত হবেনে, বড়জোড় আট । মাথার ঐ দস্তার কলসটার চাইতি যেন্ ও ছোট। গয়ের ছেড়া জোড়া তালি কাপড়খান ভিজে জুবজুবে হুয়ে গেছ। নিজিই হাঁটতি পারেনা এই কংকালসার দেহে তারউপর মাথায় পানির ভারী কলস। বন্যার পানি মাড়ায়ে দু'দুটো খাল পার হুয়ে মাইল পাঁচেক দূরের ঐ গ্রামেরতে পানি নিয়ে আইসতেছে ওটুকান ঐ ছ্যামড়ি নুরী। আর আমি চাইয়ে চাইয়ে দেখতিছি বড় রাস্তায় উইঠে গ্যারেজখানার সামনি বুসে।

মায়ার ধুরেছে আমায়, মায়ায়, তাইতি গ্যারেজখান আর ছাড়তি পারিনে। বহুতদিনের অভ্যেস। আসলকতা হয়তো ঠিক তাও না। ঐ অ্যাকসিডেন্টির পরতো আর কোন মেকানিকের কামটাম করতি পারিনে; বাম হাতকান সচল আছ, তাইদে গ্যারেজের গাড়ীর চাকা টাকা মুছে টুছে দিই আর কি। যে ক'টাকা মালিক সাবে দয়া কুরে বা মায়া কুরে দেয় তা দেই পেটের ভাত জোগার আর মায়ের চোখের জল মুছা- এই কামদুখান একটুসখান করে সারতি পারি।

কি ভীষণ বন্যা হুয়েছেরে বাবা এবার,সারা গ্রাম বন্যার পানিতে প্রায় সবই ডুইবে গেছ। কেবল এই বড় রাস্তা খানই যা একটু চাগান দে জেইগে আছ।

আমগো গ্রামে মোটমাট তিনটে চাপকল ছেল। আগির বছর বিদিশতে কারা এইলো, কি সব কুরল আর বুলে গেল ওদুটোত কি যেন বিষ উঠে বলে, কি যেন নাম কুলো, আসিনিক না কিযেন। দূর অত কঠিন নাম ! কি বিষ কেডায় জানে। কতদিন ধুরে আমরা তো ওই পানিই খাইছি। কই কি হুয়েছে। গ্রামের অন্যরাও উনেকে আমার মুতো কুরে ভাবতেইলো। ওই বিদিশি গোর সাথ এক বাংগালী আফাও আছিল। ইস কি সুন্দর আফাখান। কথা শুনলি পরাণ ডা জুড়ায় যাতি চায়। হেয় আফায় দেখাই দেল গ্রামে ওই বিষের লাইগি কত জনের পায়ে গায়ে কত রোগে ভুগতেলো। সত্যিই ভয় পাবার মতোই তখন। কেডায় জানতো কিএর লাইগি কেরামত চাচার পা ফুলে গোদ হুয়েলো। আমরাতো ভাবিছি ক্ষেতে কাম করতি গে কোন পোকামাকড় লেগেছ। কানাই ডাক্তারও

তো তাই বুলেলো। আফা আর বিদিশিরা অনেক বুঝাইল। অনেক ছবি টবি দেখাইল। কে কি বুইজল কি জানি। তয় ভয় হগলতে পেইলো। না হলি ওই চাপকল দুটোর দিকে আর লোক ভুলিও পা মাড়ায়না! বাকী একখানই চাপকলই তারপরতি হুলো গ্রামের হাজারখান মানুষের খাওনের পানির একমাত্র সম্বল।

এই বন্যার পানিত তাও ডুবি গেছে। পানি আনার জন্যি এখন পাঁচ মাইল দূরের নন্দিগ্রাম ছাড়া আর কোন উপায়ই থাইকলোনা। তাও কি যাওয়াডা এত সহজ। এই বন্যার পানি পার হুয়ে যাতি হুবে। মাঝে আবার দুটো খাল। ঠাওর না করতি পারলি খাতি হবিনি চুবানি। খাল দুটো উপরে যে বেড়ি বাঁধ তা আর কজনা বন্যার নিচে অদৃশ্য অবস্তায় ঠাওর করতি পারি বলো। তবুও তো পেটের দায়। জীবন বাঁচাতি হুবে বুলে কথা। পানি না হলি যে জীবন একিবারে কারবালার মাঠ হুয়ে ওঠবেনে। হায়রে পানি , তুই ই জীবন বাচাইস আবার বন্যা হুয়ে এত কষ্ট দিস মানুষগুলানরে সেও তো তুই, চখির কান্নার বর্ষা তাও তো তুই রে পানি, তুইই। একই অঙ্গে তোর কত রূপ ওরে !

কত কষ্ট সই যাচ্ছে পানির সন্ধানে গেরেমের মানুষ গুলান, যাচ্ছে ঐ নুরীর মতো একরত্তি পোলাপানগুলাও।

মাসতিনেক আগে এমপি সাব আইয়েলো। এইসে বুলেল, এই বড় রাস্তার দুপাশে দুটি পানির কলের স্থায়ী বন্দকবস্ত কইরে দেবেন। মেম্বারও সেম দিন সেই কথার রেষ ধরি একই বুলে গেলো। কিন্তু কই , কে আর সে কথা ফলায়। বলা পুর্যন্তই। এমপি এক মুখ দিয়ে বুলল আর মেম্বার ওকান দিয়ে শুইনল। আর কাজ সব সভার ভিড়িই হারায় গেল।

মেম্বার কুরব কাম! বন্যার পানি ঢুকতি শুর করতিই তো মেম্বার গেছ ঢাকাত ছাবালের কাছ বেড়াতি। আর এমপি কাইল পরশু নাকি আইসতেছে রিলিফ দিতি। হয়তো দেবেনে থানকতক কাপড় , কিছু স্যালাইন, কিছু চাইল ডাইল আর গেরামের মানুষগুলানের নিজেগো মধ্যে কাড়াকাড়ি করার অভ্যাসটাতে একটু খোঁচা। কদিন আর চইলবে , ক'দিন! এক আধবেলা তবুও না খাই বাঁচা যায়। তার উপর আমাগো গেরামে একদম না খাই থাকার মতো গরীব মানুষ আসলেই খুব কম। তিনবেলা না হলিও দুবেলা খাতি পারে বেশীর ভাগ মানুষই। বন্যার আগেই ভাগ্যিস ধান উঠে গেল। না হলি সত্যি না খাই মরতি হুতো আইজ সকলের। কিন্তু কামযে নাই মাইনসের। জমান ধান চাল ক'দিন। আর জাগোর কিছুই নাই তাগো। আল্লাই জানে কবে পানি সুরে যাবে। আবার ক্ষেতে সবুজ ধান গাছ বাতাসে নাচতে থাইকবে। সোনা রঙের ধানের হাসিতে মাতবে বিল এর পইর বিল।

হয়তো সবই ঠিক হুয়ে যাবে আল্লাহ চায় তো। কিন্তু পানি! খাবার পানি যে মূল সমস্যা আমাগো। বন্যার পরি নাকি আরও রোগ শোক বেইড়ে যায় রেডিও তে শুনতিলাম সকালে। বিশুদ্ধ বিষমুকতো পানি খাতি কচ্ছিল সকলরে। শেষকালে না

চারদিকে এত পানির মাঝি থেইকেও পানির অভাবে রোগ টোগ হুয়ে মরতি বসে গেরামের লোকজন!

আচ্ছা তাইতো এত কথা আমি কেন ভাবতিছি। গ্রামের অতগুলান মানুষ পানির কষ্ট পাতিছে। কালকের তে আবার শুর হুয়েছে রোজা। সারাদিন না খেয়ে সন্ধ্যায় পানির জন্যি গ্রামে জান হাহকার পুইরে যায়। কিন্তু আমি কি করতি পারি?

আমারতো একখান হাতই নি্। আর পা যা আছে তাতে এক কদম সামনে দেই তো দুই কদম যেন পিছে। শক্ত পোক্ত হাত পাও, বিস্তর জমি জিরাত, টাকার পাহাড়, খেমতা, মেম্বারি্ব আছে যার মধ্যি তার তো ভাবনা নি কোন ; ভাবনা নি ওমন খেমতা বান অন্যগোও। আমার মধ্যি কেন ভাবনা আসবি? আমি পইড়ে রই খাইয়ে না খাইয়ে পথির মধ্যি, ভাঙা ঘরে বুড়ি মা পানির জন্যে এর ওর পা ধরে। আমি তো পঙ্গু , কিই বা করতি পারি!

নুরী ছেমড়িডা বড় রাস্তা ছাড়ি বন্যার পানিত নামতিই তাল সামলাতি পাইরলনা। কষ্টে আনা পানি সব বন্যার জল গিলে নেল। না কিছু একটা করতিই হবে। মাথায় সত্যি বুদ্ধি একটা এইসেও গেল।

খোঁড়াতি খোঁড়তি খালের পারে গে দাঁড়ালাম। ওই তো হারু মাঝি বুসে আছে।

হারু কাহা , ও হারু কাহা , আমারে একখান নৌকার ব্যবস্থা কুরে দেবা।

কেন নৌকা দে কি করবিরে তুই আলী।

যা অনেকে পাইরেও কুরতেঝেনা।

মানে কি বলতিছ

...ওতো কইত পারমুনা। দাওদিন আগে পরে দিখো।

ঐ যে ঐ বিলে আমার ভাঙা নৌকা খান ভাইসতিছে, পারলি ঠিক কইরে নেগে। ওটা যেদিন এই বন্যায় ভাসি গেল। আল্লাহর অস্তে দে দিছ। রেইখে কোন লাভ নি। খালই বোঝোন যায়না, পার হওনের টাকা কি দিব মাইনসে। নৌকা দে কি করবিরে।

তোমার যে কি বুলে ধন্যবাদ দেবান...

পরিশেষ

এরপর আলী পুরান গ্যারেজ মালিককে অনুরোধ করল, বুঝাল। বুঝল কিনা জানিনা, তবে মায়ায় হোক বা দয়ায় ঠিক করে দিল নিজ টাকায় নৌকাখান। হাজার হোক এই আলীই ছিল তার একসময়ের সবচেয়ে দক্ষ আর কর্মঠ কর্মচারী।

পরদিন সকালে একহাতে বৈঠা বেয়ে বন্যার পানি ঠেলে ঠেলে গ্রামে বাড়ী গুলাতে গিয়ে জোড় করে করে একরকম বলতে গেলে পানির কলসি, হাঁড়ি নিয়ে নৌকায় উঠালো। নৌকা নিয়ে আলী চলে গেলে সেই দূরের নন্দি গ্রামে। আলীর আনা পানিতে ইফতার করল বিশুদ্ধ বিষমুক্ত খাবার জলে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ।

মিষ্টি মুখগুলোর মুখে সন্ধ্যায় শান্তির পরশ দেখে মনে হলো আলীর, তার জীবন সত্যি যেন ধন্য হয়ে আজ। পরদিন সকালে নৌকা নিয়ে যাবার সময় সেই অষ্টবর্ষীয় নূরী মেয়েটাকেও সাথে নিয়েছিল। তার সাথে করিম এবং রুবেল দুজন দ্বাদশী বালকও জুটে গেল আলীর নৌকায়। প্রতিদিন চলতে লাগল পঙ্গু আলী আর তার শিশুদলের পানি সরবরাহ বিনা স্বার্থে এবং বিনা অর্থে। এভাবে পিপাসার্ত গ্রামবাসীর মুখে পানি জল তুলে দিয়ে সে ভাগাভাগি করে খেতে লাগল গরীব সতীর্থ মুনষগুলোরই আদর মাখা মুঠো ভাতের কিছু অংশ আর পেতে লাগল মনে মনে অবারিত শান্তি।

আ ড়া লে ও ক ত বা স্ত ব তা

'শুরু করাটাই কঠিন, আসলে ঠিক শুরু করার ব্যাপারটি নয়, শুরু কিভাবে কোন আঙ্গিকে করতে হবে সেই ভাবনার একটা সহজ সমাধানে আসাটাই কঠিন। '--ভাবছিল ভরপেটে সদ্য প্রস্থানপ্রায় দুপুরে আপন ঘরের এক চিলতে বারান্দায় বসে মৃদুল নামের যুবকটি।

ওমন সহজাত ভাবনার সূত্রপাতের ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন, কারন ভাবনার অতি স্বাভাবিক এক গুনাবলিই হলো তার অনিয়ন্ত্রিত এবং যত্রতত্র আগমন রীতি। এই যেমন যখন সে দুপুরের খাবার খেতে বসেছিল তখনও আকাশে মেঘগুলো ঠিকই ছিল, তবে কালো রূপটাই ছিলনা কেবল। হঠাৎ মাত্র ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই তার রূপ ভীষন ভাবে পরিবর্তন হলো। আর এখন তো সেই কালো মেঘ নিংড়ে ঝরতে শুরু করেছে ঘন বৃষ্টির ধারা। মৃদুল বাতাস এখন মৃদুল নামক যুবকটির গায়ে এসে আঘাত হানছে ঝড়ো হয়ে।

যুবকটির মনে অতীত পৃথিবীর চিত্রগুলো ভীষনভাবে দাগ কেটে স্থায়ী হয়ে উঠেছে। তাই তার অভিলাষ পূরনের খায়েশ চরিতার্থ করার মানস যখনই মাথা চাড়া দেয়, সেই অতীত ভূবন তার মাথায় ঘুরতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবতার চরম পরিবর্তন আর উন্নয়নের রূপ তার সেই পরিকল্পনার সাথে খাপ খেতেই চায়না। সে তখন ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ওঠে। থমকে যায় গতি মৃদুল নামক যুবকটির জীবন পরিকল্পনায়।

সে মনে মনে ভাবে সে কি আসলেই কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত, সিজোফ্রেনিয়া ধরনের কোন রোগ। হয়তো হতেও পারে। না হলে এই যে ঝুমঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, তার মনে হচ্ছে সে যেন বারান্দায় নয়, বসে আসে অষ্টাদশ শতকের কোন দুর্গের ছাদের কানায়, মেঘ ডাকলেই মনে হয় যুদ্ধের দামামা বাজছে, কিন্তু সে যুদ্ধে যাবেনা, সে কবিতা লিখতে বসবে, বৃষ্টির কবিতা, তার সেইকবিতায় মুগ্ধ হয়ে থামিয়ে দেবে যুদ্ধ ভয়ংকর কোন সেনাপতি। কিন্তু সে পরক্ষণেই বোঝে পুরোপুরি সিজোফ্রেনিক নামক মনোরোগে আক্রান্ত হতে পারেনি, বাস্তবিক পারিপার্শ্বিকতা তার কবিতা লেখায় বড় বাধ সাধে। সভ্যতার পেষন শুরু হয়, মোবাইল বেজে ওঠে, বারান্দা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় পুনঃপুনঃ রিং এর কঠর ডাকে।

ফোন রিসিভ করে ঠিকই কিন্তু অপর পারের মেয়েটার অসাধারণ মিষ্টি কণ্ঠ তার মাঝে বিরক্তির উদ্রেগ ঘটায়। অথচ এই কণ্ঠ শোনার জন্য সে রাতের পর রাত জেগে অপেক্ষা করেছে। কখনও রাত দুটো তিনটের পর মোবাইল সরব হয়েছে। মেয়েটা কথা বলেছে, সে শুনেছ রাতের শেষ প্রহর অবধি। কিন্তু সেই ভাল লাগা মেয়েটা,যার চেহারার মাধুরী কণ্ঠের চেয়েও মধুর, সে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলে পালিয়ে মাত্র মধ্য বিরতির দুমাস কালিন সময়ে। মৃদুল সে সময় ইন্ডিয়াতে ছিল বড় ভাই ভাবির ট্যুরের হেল্পার হিসাবে।

মেয়েটা কি যেন বোঝাতে চেয়েছিল, বোঝার চেষ্টাই করেনি মৃদুল। মেয়েটা কথা বলা অবশ্য বন্ধ করেনি। এমনকি দেখা করাও। মেয়েটা তাকে সাফাই দিয়েছিল। সে সাফাইএর মাঝে মৃদুলকে উচ্চ আসনে বসানো হয়েছিল না কি নিম্ন সেটা ভাবতে গিয়ে মৃদুল চলে গিয়েছিল অন্য জগতে, তার চোখে ভাসছিল কোন এক মোঘল রানীর পরকীয়ার অপূর্ব কাহিনী।

মেয়েটা বলেছিল, স্বপ্ন বিলাসী মানুষের সাথে প্রেম করাটাই ভাল, বিয়ে নয়, বিয়ের জন্য স্বপ্ন নয় বাস্তবতা প্রয়োজন। সে আরও বলেছিল বৃষ্টিতে মাঝে মাঝে বা কদাচিৎ ভেজা যায়, প্রতিদিন স্নান করা যায়না বৃষ্টির জলে। এমনেতেই মৃদুল ভালবাসর বিষয়টিতে অপূর্ণ ভাবুক ছিল। ভালবাসত কেবল সেটাই বুঝত। মেয়েটার বৃষ্টি সম্পর্কিত কথায় আরও মুগ্ধ প্রেমিক যেন বনে গেলো মেয়েটার ।

ভাবনা শুরু হয়েছিল অনিয়ন্ত্রিত ভাবেই তখন থেকে, ভেবেছিল হুট করে গভীর ভালবাসায় যে বিয়ে হয়ে গেলো সে বিয়ের পরও মেয়েটা কেনো তার পরম সতীত্ব তুলে দিতে সংকোচ করল না মৃদুল নামের এক আধপাগলা যুবকের হাতে। বিয়ে নামক ব্যাপক বন্ধনের পরও কি অপ্রাপ্তি থেকে যায় ওমন এক বুদ্ধিদীপ্ত রমনীর? ভাবনার শুরু থেমে যায় মৃদুলের। শিথি নামক মেয়েটার মায়া তাকে শিথির দেহের চটুল সরস গন্ধের নেশা থেকে মুক্তি দেয়না।

কত রাতে সে ভেবেছে, আসলেই কি সে নেশা থেকে মুক্তি যায়। সে ভাবনার সূতোও ছিড়ে গেছে বারবার। সে কল্পনায় নিজেকে মোঘল রাজার প্রতিদ্বন্দি ভেবে অহংবোধে ডুবেছে ভেসেছে, হেসেছে আপন মনেই।

কখনও ভাবনায় গর্ব এসেছে অন্যভাবে। শিথির স্বামী পুরুষটি হয়তো শিথির প্রেম পেয়েছে, সোহাগ আদর, দেহ মন সবই পেয়েছে, সঙ্গ পেয়েছে, পাচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস তার চেয়ে মৃদুল বেশী পেয়েছে। তা হলো বিশ্বাসের দৃঢ়তা। স্বামী পুরুষটি কখনই যে জিনিসটা পায়নি শিথির কাছে। দেহের কাছে বিশ্বাস কত অসহায়!

ফোনটা না ধরলেই ভাল হতো। বৃষ্টির মাঝে মাত্র হারিয়ে যেত বসেছিল। কিন্তু সে সব ফেলে এখন ছুটতে হবে শিথির বাসায়। খুব বেশী দূরে নয়। রিকশা দিয়ে গেলে মাত্র দশমিনিট। রিকশা না পেলে সে হয়তো বৃষ্টিতে ভিজেই যাবে। ঝড়ো বৃষ্টিকে রোদ ভেবে নিতে তার খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়। সে যে মনে মনে সিজোফ্রেনিক।

বেরিয়েই পরে ঘর থেকে। রিকশাও পেয়ে গেছে। বৃষ্টিও বাড়ছে। মনে শুরু হচ্ছে কত রকম ভাবনা। মুক্ত পরিবেশে মনটা বড় বেশী মুক্ত স্বপ্ন দেখতে যায় মৃদুলের। হঠাৎ ইচ্ছে হয় শরৎচন্দ্র র মত ঘড়বাড়ি ছেড়ে পথে নেমে যেতে, দেখতে বুঝতে লিখতে জগতের প্রকৃত রূপের বৈচিত্রতা খুব কাছ থেকে। হঠাৎ সে নিজেক আবিষ্কার করে নিভৃত গ্রামের পথে...কত রকম মানুষের নৈকট্য পাওয়ায় হয়নি, জানা হয়নি মানুষের কত অজানা সরূপ। না হয়তো সে সত্যিই একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পরবে। জানাবে না কাউ কে কোন কিছুই।

বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসতে থাকে । গায়েও পানি লাগে ছিটে ফোটা। ভাবনা এখন হঠাৎ ভিন্ন মাত্রা পেতে থাকে। নিজেকে মৃদুলের ভিলেন মনে হয়। কষ্ট হয় হঠাৎ আবার শিথির স্বামী বেচারাটার জন্য। ঐ লোকটাকেও তো শিথি ভালবেসেই বিয়ে করেছিল। সে কি তবে তার অঢেল অর্থের জন্য? তবে তার নিজের স্থান কোথায় স্বার্থান্বেষী শিথির কাছে। সাময়িক আবেগ আর আনন্দ। কিন্তু সে কি চিরকালের? পৃথিবীর সাথেই বা একজন মানুষের সম্পর্ক কতকালের ? ভূবন এর সব সম্পর্কই তো সাময়িক।

রিকশা শিথিদের বাড়ীর গলির কাছে প্রায় চলে এসেছে। হঠাৎ আবার বৃষ্টির ঝাপটা বেড়ে যায়। সে যেন ঝাপটা নয় সরব হয়ে মৃদুলের কানে কানে বলে গেলো কঠিন সেই বারতা।

মৃদুল হঠাৎ ভেবে নিল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শিথির মোবাইলে রিং দেয়ার আগেই শিথির স্বামীকে এসএমএসটা খুব সংক্ষেপে লিখে পাঠিয়ে দিল। একবারও ভাবলানা নিজেও তো ধরা পরে যাবে শিথির সাথে। কেনো জান তার হঠাৎ খুব সততা দেখানো সাধ হলো, মায়া জাগল হলো স্বামী বেচারাটার জন। কিন্তু ভাবলনা খুব বেশী একটা। যেই ভাবা সেই যেন কাজ।

শিথি খুবই উত্তেজিত ছিল , অথবা বৃষ্টি তাকে উদ্বেলিত করেছিল চরমভাবে গোপন প্রনয়ের তাড়নায়। জড়িয়ে ধরল আধোভেজা শরীরে। খোলা বারান্দায় আধো ভেজার চেষ্টায় ছিল মেয়েটা।

আবেগের প্রচন্ডতা আজ যেন নতুন করে বুঝল মৃদুল। হঠাৎ খেয়াল হলো এই আবেগ তার মনে দেহে চেতনায় চরম আবেশ ভরিয়ে দিয়েছে বহু আগেই, এই যে ছুটে আসা মুহুর্তে সে তো সেই আবেশের ফল। এর থেকে তার মুক্তি নেই। আসলে তার মন এর থেকে মুক্তি আসলেই চায়না। সে আরও আবেগের বশ্যতা উপলব্দি করে দিগম্বর শিথির বাহু বন্ধনে নরম বিছানায় চরম ভালবাসায়।

ভুল বুঝতে পারে। এই মেয়েটিকে তো সেই আগে ভাল বেসেছিল। স্বামী পুরুষটির অর্থই তার পরাজয়ের কারন। তার কেনো দোষ, কেনোই বা দোষ দেবে সে শিথিকে। ভালতো তাকে শিথি বাসেই। কিন্তু তার যে অর্থ বিত্ত নেই, আছে কেবল স্বপ্ন বিত্ত। মেয়েটা দুটোই চেয়েছে, সেটা কি মেয়েটার দোষ?

অন্যদিকে সে আবার ভাবে, স্বামী বেচারাটারও তো কোন দোষ নেই। যদি এখনই চলে আসে তার এসএমএস পরে জেনে যায় যা আদৌ কখনও জানা উচিৎ নয় বলেই মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ভালবাসার দৈহিক আলোড়নে । না কেনো লোকটা কে শুধু শুধু কষ্ট দেবে। এই অধিকার তার নেই।

নিজেকে মুক্ত করে মুহূর্তে শিথির আলিঙ্গন হতে। বলে, 'আমার কল্প বিলাসী ইনটুইশন বলছে তোমার স্বামী চলে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে, সত্যি মনে হচ্ছে। প্লিজ আমি এখন যাব। যেতে দাও।"

তা কি আর দেয়। কিন্তু মৃদুলের ও জেদ। চোখে হালকা পানি চলে আসে শিথির, কিন্তু মৃদুল কে সে বিশ্বাস করে। মৃদুল চলে যায় । যাবার আগে ঠোট দিয়ে শিশির ভোজা ঠোঁট দুটো ঘন স্পর্শ করে বলে ওঠে 'তোমাকে খুব ভালবাসি, খুব বেশী।'

শিথিও বলে ওঠে,' আবার কবে?"

মৃদুল ঘর থেকে বের হয়ে দ্রুত গলির আড়ালে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর তার মোবাইলে স্বামী বেচারার মোবাইল থেকে কল আসতেই থাকে। সে রিসিভ করেনা। অবশেষে একটা এসএমএস ও আসে। যে মেসেজে খুব গালাগালি থাকে তার জন্য, তার সতী সাবিত্রি স্ত্রীর প্রতি তার মনে সন্দেহ ঢুকানোর জন্য।

ওদিকে স্বামী বেচারাকে শিথি জিজ্ঞেস করে সে কেনো এই অসময়ে বাসায় এসেছে?

স্বামী বেচারও মিথ্যে উত্তর দেয়। বলে, 'খুব মনে পড়ল এই বৃষ্টিতে, তাই আদর করতে ছুটে এসেছি ডার্লিং।'

সে মিষ্টি কথায় শিথি খুশি হলো কিনা জানিনা, কিন্তু সে মুগ্ধ হলো মৃদুলের ইনটুইশন ক্ষমতার দৃঢ়তায়।

হা জা র দু য়া রী র স্ব প্ন পে রি য়ে

পায়ের তলার প্রতিটা অনুবীক্ষনীক ছিদ্র দিয়ে হিম শিহরণ ঢুকছে দেহের অভ্যন্তরে। খালি পায় হেঁটে যেতে তবু একটুও কষ্ট হচ্ছেনা। বরং আনন্দ লাগছে, জাগছে প্রাণে চঞ্চলতা। জমাট বরফ বিছানো পথ । ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেছে। সামনেই বামে বেঁকেছে বরফ পথের মোড়। এইতো পৌঁছে গেলাম বলে।

মোড় ঘুরতেই দেখি একি শীতল শিহরণ উধাও। তপ্ত বালু এখন পায়ের তলে। উষ্ণ শিহরণ। উষ্ণতার পরশ এখন দেহের মাঝে। কি আশ্চর্য ! কত দ্রুত বদলে গেলো আনন্দ লাভের ধরন। ঐ তো দেখা যাচ্ছে , ঐতো জলের দর্পন। মেঘ উড়ে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে ঐ তো ঐখানে । যেখানে গন্তব্য ভেবে এই নগ্ন পদব্রজ। দৃষ্টিতে দুয়ারটা স্ফটিক আলোক ঝলক উগড়ে দিচ্ছে। আরেকটু পথ মাত্র। তারপরই দুয়ারের হাতলে পড়বে কাঙ্খিত হাতের চাপ। দুয়ার খুলে যাবে। চলে যাব ওপাশে। ওপাশেই তো মুক্তির পসরা নিয়ে বসে আছে কেউ। তার চেহারায় নিশ্চয় হবে বেশ নিস্পাপ। তার পায়ের তলার মাটি তে যে বাদামী রঙ, সোনার বাংলার মাটি মা । ...

পৌঁছে গেছি। চোখে হঠাৎ কুয়াশার মতো বাষ্প ধোয়া। সব অস্পষ্ট। দ্রুতই আবার সব স্বচ্ছ। ওমা! হাজারখানেক দুয়ার কেনো সামনে? পথিক তো সঠিক দরজায় সঠিক পথের সন্ধানেই হয়ে যাবে বিভ্রান্ত। মুষড়ে পড়ে চিত্ত ...

...'আরে ভাই ওঠেন ওঠেন, নামবেন না নাকি?' বলতে বলতে আমার কাঁধ ধরে ঝাকাচ্ছে লোকটা। চোখ মেলে বোকার মতো অবাক দৃষ্টিতে একবার তাকালাম তার পানে। লাল একটা গেঞ্জি গায়ে তার। ঠোঁটের উপরে সরু একটা গোঁফ। ফর্সা মুখ। বেশ নিস্পাপ চেহারা। ঘুম ঘুম চোখে তাকে হঠাৎ মনে হলো দুয়ারের ওপাশে সেই শান্তির পসরা নিয়ে বসে থাকা লোকটি । সম্বিত ফিরে পেতেই দ্রুত বুঝলাম । বাসে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলাম স্বপ্ন।

'কি ভাই, বাস তো আর যাবে না, আর কত ঘুমাইবেন?' একটা কালো রঙের ব্যাগ কাঁধে ঝুলাতে ঝুলাতে লোকটা আবার বলল।

' এইটা কোথায় ভাই?' হাত দুটো উঁচিয়ে একটু আড়মোড়া খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম।

বাসের হেল্পার ছুটে এল ' নামেন না ক্যান । আর কত ? বাস ভিতরে ঢুকামু। তাড়াতাড়ি করেন। '

লাল গেঞ্জির লোকটা বাস থেকে এক পা নিচে দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণ। উঠে দৌড়ে গেলাম। তার দ্বিতীয় পা মাটিতে পড়ার আগেই আমরও এক পা ছুঁয়ে নিল মাটি।

' ভাই এইটা কোন জায়গা?'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

' আমি তো নামবো যাত্রাবাড়ী।'

'ওহো! হেল্পার কে বলে রাখবেন না ডেকে দিতে, আপনিতো অনেক দূর চলে এসেছেন। এইটা তো জালকুড়ি। '

মনে মনে বললাম, 'ব্যাটা লাল গাধা, বাসে ঘুমাইয়া যে হাজার দুয়ারীর স্বপ্ন দেখব এইটা কি আর জানতাম রে।"

মুখে বললাম , ' ও আচ্ছা' কিন্তু আদতে এই নামের কোন জায়গার নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়েনা। একটু বোকার মতো হাসি চলে এল ঠোঁটের কোনায়। ব্যাটা লাল গাধাটা একেবারে গাধা না। আমার বোকা হাসিতে বুঝে গেলো এই জায়গা আমার অচেনা।

বলল, 'এইটা নারায়নগঞ্জের নতুন হাইওয়েতে ফতুল্লার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু এখন আপনি যাবেন কি করে। শেষ বাস ও তো চলে গেছে অনেক আগেই।'

কথা বলতে বলতে দুজন হাঁটছিলাম। থমকে ঘড়িটার দিকে তাকতেই দেখি বাজে রাত ১১টা। সেই উত্তরা থেকে যখন বাসে উঠেছিলাম তখন বাজছিল সন্ধ্যা মাত্র ৮টা । ৩ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। ভাবছি যাত্রাবাড়ি থেকে জালকুড়ি না মুড়ি তাইলে তো অনেক দূরত্বই হবে মনে হয়। নিজের উপর রাগ হচ্ছে। সন্ধ্যায় বিপাশার বুকের উষ্ণ স্পর্শ না খুঁজলেই তো হতো। বিপাশাকে তো আরও কতদিনই ওরকম নিরালায় পেয়েছি কাছে। আজ একটু মিস করলে কিইবা হতো। না আমার সব পূর্ণতা লাগবেই। ওদিকে ফাহিম বারবার কল দিচ্ছিল। বিরক্ত হচ্ছিলাম ভীষন। কেনো হবোনা। অধরে তখন বিপাশার পুরষ্ঠ অধরের আচ্ছাদন। সাতবার মিস কল আসতেই ধরে বললাম আসছি ১০টার মধ্যে। বন্ধই করে দিয়েছিলাম মোবাইল।

পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল টা বের করতেই মনে পড়ল কেনো কোন কল আসছেনা। সেই যে বন্ধ করেছিলাম। আর তো অন করা হয়নি। নিশ্চয় ফাহিমরা দুশ্চিন্তা করছে। আজকে রাতে যাত্রাবাড়ীতে ওদের বাসায় থাকার কথা । আরও বেশ কয়েকজন বন্ধুও থাকবে। কাল একুশে ফেব্রুয়ারী । অফিস ছুটি। রাতে সবাই মিলে তাস পেটাবো আর গিলবো হুইস্কি অথবা ভদকা। দুরকমই ব্যবস্থা হয়েছে, কিরন বলেছিল বিকালে। তারপর পাখীডাকা ভোরে ঢুলু ঢুলু চোখে পায়ের জুতো বাসায় ছেড়ে চলে যাব একুশের প্রভাত ফেরীতে শহীদ মিনারে। ফাহিম আর আমদের আর তিন বন্ধুর একটা সদ্য উদ্ভুত ব্যান্ড দল আছে। নাম *'ফাটাফাটি মেটালিক'*। হার্ড রক গায় সব। একটা ক্যাসেট ও বরে হবে শীঘ্রই। শহীদ মিনারে অর্পনের জন্য একটা ফুলের গোলাকার সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুনেছি। উপরে বড় করে নাকি লেখা

" বাংলা ভাষা -আমার গর্ব - আমার আশা
বাই
ফাটাফাটি মেটালিক ব্যান্ড"

' কি ব্যাপার থমকে গেলেন যে? কি ভাবছেন?' লাল গেঞ্জি জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ। না কিছুনা। এখন যাত্রাবাড়ী কিভাবে যাব ভাই একটু বলবেন। কোন ট্যাক্সি বা সি এনজি পওয়া যবে।'

বলতে বলতেই একটি সি এনজি আসতে দেখলাম উল্টো দিক থেকে। ' আই সিএনজি'

থামলো না।

'থামবে না ভাই। এতো রাতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না এই নির্জন হাই ওয়েতে। আপনারও রিস্ক নিয়ে যাওয়া টা ঠিক হবেনা মনে হয়।'

' তাহলে উপায়' বলেই পকেটে হাতড়ালাম । পেলাম একটা শেষ সিগারেট। একটু দুমড়ে গেছে । হাতে ঘষে ঘষে সোজা করে নিলাম। কিন্তু ম্যাচ আর পেলাম না কোন পকেটে। ' ভাই, ম্যাচ হবে?'

' না সিগারেট খাই না তো।'

দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে আশেপাশের । রাস্তার ওপাশে ঢালুর ডানে টং দোকানটার ভাঙা ঢাকনায় তালা ঝোলাচ্ছিল মাত্র ছেলেটা। চোখ পড়তেই চিৎকার দিয়ে উঠলাম' ঐ ছ্যামড়া , তালা লাগাইসনা, একটা ম্যচ আর সিগারেট দিয়া ল আমারে।

উত্তর এল ' লাগায় ফালাইছি। খোলন যাইব না আর।'

' ক্যা খুলিবি না হারাম জাদা, টাকা দিমুনা নাকি তোরে?'

' করিম, আরে আমি সালাম, খোল খোল, ওনারে একটা ম্যাচ আর সিগারেট দিয়া ল একটু' লাল গেঞ্জি বলে উঠল হঠাৎ।

যাক জানা হলো ব্যাটার নাম। এই সামান্য উপকারে তাকে আর গাধা বলতে ইচ্ছে করছেনা।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে ওপারে যেতে যেতে বললাম, ' আপনার নাম সালাম?'

' হুঁ, আপনার ?'

' শিহাব'

মাত্র তিনটে বেনসন ছিল করিমের দোকানে। নিয়ে নিলাম। দু'টাকা বেশী দেয়াতে সে যে এক হাসি দেখলাম করিমের মুখে তাতে মনে হলো হারামজাদা গালি কেনো আরও বেশী কিছু শুনালেও এখন তার গায়ে লাগবেনা।

ওপারে উঠেই সালাম সাহেব বলে উঠল, 'চলেন আমার সাথে, আমার বাসায় থাকবেন রাতে। এত রাতে অচেনা পথে গিয়ে আর লাভ নেই। চলেন। এইতো ঐ দূরের বট গাছটা পেড়িয়ে ডানে বাম নিলেই আমার বাসা। চলেন। চিন্তা করেন না। '

' কিন্তু, আমাকে চেনেন না, জানেন না।'

'তাতে কি, আপনাকে ভয় পাওয়ার সামন্যতম কোন কারনই নেই আমার বা আমাদের বাসার তিনটি প্রাণীর। '

দ্রুত একটু ভাবলাম। বুঝলাম। এই ভাল। রওয়ানা হলাম নির্জন পথে দুজনে।

' তিনটি প্রাণী মানে কেকে বাসায় আপনার?'

' আমি , আমার বৃদ্ধ দাদা আর ছোট বোন। '

কথা বলতে বলতে এভাবে দুজন হাঁটছি। কিছুক্ষনের মধ্যে একে অপরের সম্পর্কে বেশ অনেক কিছু জানা হলো। জানলাম সালাম সাহেব চাকুরী করেন বনানীতে এক গার্মেন্টসে। প্রোডাকশনে আছেন। জানলাম বাসার তাদের জন স্বল্পতার কারন। করুন কাহিনী তাদের পরিবারে ব্যাপক মাত্রায়। দাদা পঙ্গু । আজ থেকে নয়। তার পঙ্গুত্বের সূচনা সেই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। সেদিন তিনিও ছিলেন মিছিলের মাঝে। গায়ে গুলি লাগেনি ঠিক তবে একটা পা ভেঙেছিল। রিকভার হয়নি পুরো আর। আজ তাই পূর্ণ পঙ্গুত্ব লালন করছেন এই জালকুড়ির নির্ভৃতে। সালাম সাহেবের পরিবারের নিদারুন ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। বাবা ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে বাড়ী থেকে বের হয়ে ছিলেন। আর কোন দিন ফিরে আসেননি। সালাম সাহেবের বয়স তখন মাত্র এক বছর। মা তার দুবছর পরে বিয়ে করেছিলেন এক ব্যক্তিকে। সালাম সাহেবের ভাষায় ঠিক ব্যক্তি নয় নরপশুর সাথে। ছোট বেলায় সেই পশুর বাড়ীতে নিদারুন নির্যানত সহ্য না করতে পেরে দুস্থ দাদুর কাঁধে ভর করেন। পশুর নির্যাতনে মাও মারা যায় বছর দশেক পরে। ততদিনে সেই ঘরে জন্ম নিয়েছিল মার গর্ভে এক কন্য সন্তান। মমতার অভাব ছিলনা দাদুর , সেই মেয়েকেও নিজের কাছে নিয়ে এসে মানুষ করেছেন।

নির্দ্বিধায় দুঃখের ইতিহাস বলে গেলেন সালাম সাহেব সদ্য পরিচিত আমার কাছে। তার মাঝে কোন ভাবালেষ নেই । সবই যেন অতি স্বাভাবিক। অথবা স্বাভাবিক ভেবে নিতে হয়েছে জীবনের করুন প্রেষনে।

বাড়ী বললে ভুল হবে। একটা কুঁড়ে ঘর। উপরে টিনের চালাটাই যা একটু জৌলুষ। মাথায় কাপড় দেয়া মেয়েটা দরজা খুলে দিয়েছিল। মুখটাতে আঁধারের ছায়া পড়ায় চেহারা বোঝা যাচ্ছিলনা। কিন্তু আমার মুখে যে ৫০ ওয়াটের আলোটা এসে পড়েছিল সেটাতে নিশ্চয় মেয়েটার চিনতে বাকী থাকেনি আমাকে। না হলে এর পর তাদের দূর্বল খাবারে ভাগ বসানোর কালে যতবার সে সামনে এসেছে মাথার ঘোমটা নেমে এসেছিল মুখেও।

বৃদ্ধর চোখের ভেতরে টলমলে সরোবর দেখেছিলাম অপলক চেয়ে চেয়ে সে রাতে আমি। অনেক গল্প করেছিলাম। চোখে কোন জল ছিলনা তারঁ। অবাক হয়েছিলাম। তিনি জানেন না কাল প্রভাতে শহীদ মিনারের প্রভাত ফেরীর কথা, নগ্ন পদচারনার কথা। তিনি দেখেনি একুশের আড়ম্বর অনুষ্ঠান কভূ। এ কুঁড়েতে জীবনে কোনদিন আসেনি কোন টিভি। দেখবেন কি করে। সালাম কর্মক্ষম হবার আগ পর্যন্ত কেবল টেনে

গেছেন খোঁড়া পায়ে জীবনের দুঃসহ ঘানি। কখনও ছিলেন নারায়নগঞ্জ বন্দরের নাইট গার্ড অথবা কখনও টানবাজারের গলির মুখের পাহারাদার ।

বলেছিলাম তাকে আপনি তো একজন ভাষা সৈনিক। উনি বোঝেন নি। বোঝাতে যায়নি বেশী আমি। তবে সালাম সাহেব কে বলেছিলাম, 'সকালে আমাকে একটা ফুল দিতে পারেন?'

বলেদিয়েছিলেন ওনার বোন সুমিকে ডেকে সকালে ফুল দিতে আমাকে।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম শহীদ মিনারে লোক দেখানো ঢং এ যাবোনা কাল ...তার চেয়ে এই ভাষা সৈনিককেই দেব প্রভাতের ফুল।

রাতে নোংরা বিছানায় আমার ঘুম অত ভাল যে হবেনা সেটাই স্বাভাবিক। সালাম সাহেব বেশ লজ্জা পাচ্ছিলেন । লজ্জা বেশীক্ষণ পেতে হয়নি তার। পরিশ্রান্ত দেহ তার ঘুমের কাছ সহজেই ধরা দেয় । সকালে আমাকে ঘুম ভেঙে উঠতে হয়নি। উঠেই তো ছিলাম। সুমি দুটো গোলাপ ফুল এনে পাশে রাখছিল আমার। বোঝেনি আমার মন চোখ যে খোলা তখন। তার উপস্থিতি ঠাওরে তাই খুলে গিয়েছিল বাইরের চোখ দুটিও। এক পলকে চিনে ফেলেছিলাম মেয়েটাকে। এক পলকেই। তার পরে সে দিয়েছিল ভোঁ দৌড়। ভার্সিটিতে আমাদের দুক্লাশ নিচের সেই মেয়েটাই তো। সেই সুমিই। ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত পোষাকে আসত। সবাই তাকে ক্ষ্যাপাত কলা ভবনের চত্বরে স্বাধীনতার মুর্তিগুলোর তলে আড্ডায় বসে বসে।

মনে পড়ে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির সেই দিন । টোকাই থেকে ছাত্র নেতা হয়ে ওঠা সন্ত্রাসী ময়লা মতিন তাকে সবার সামনে থেকেই হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো নিচ তলার অব্যবহৃত ময়লা ঘরটিতে। সবাই হেসেছিল তার ক্ষ্যাত পোষাকের টানাপোড়নে আর আর্ত চিৎকারে। পুর্ণ শ্লীলতা সেদিন তাকে হারাতে হয়নি সুবর্না ম্যাডামের কারনে। কিন্তু আমরা হেসেছিলাম অর্বাচীনের মত। সেদিনের পরে আর সুমিকে দেখা যায়নি কোন দিন ভার্সিটির চত্বরে। পেপারে অবশ্য পড়েছিলাম মতিন তাকে নাকি এসিড মেরেছিল। প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিল ছাত্র নেতা ময়লা মতিন। সপ্তাহখানেক ভার্সিটিতে আন্দোলন চলেছিল। আমরাও একদিন যোগ দিয়েছিলাম মিছিলে। কিন্তু সেই সপ্তাহখানেক। তারপর সব ছাই চাপা পড়ে যায়।

আজ দেখলাম কত দিন পরে। দেখলাম সেই মিষ্টি মায়ার মুখের অর্ধসৌন্দর্য খন্ডন এক নজর।

আমি তার মিষ্টি সরল মুখ আবারও দেখতে চাই। বসতে চাই তার সাথে শহীদ মিনারের চত্বরে।

বাসে বসে দেখা সেই হাজার দুয়ারের স্বপ্নে আমি কেনো সঠিক দুয়ার পার হয়ে শান্তির মাঝে যাব, যাবে তো ঐ বৃদ্ধ দাদা, যাবে শ্রমিক সালাম আর মিষ্টি মুখের নির্দোষ সুমি।

ত থা পি

ও তখন ক্লাশ সেভেনে পড়ত।

ভার্সিটির ক্লাস শেষে দুপুরের পর অথবা বিকেলে যখনই ফিরতাম আমি, দেখতাম ও দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। পড়নে রঙিন কোন ফ্রক। তাকাতেই একটা হাসি দিত। সে হাসিতে শিশুসুলভ দৃশ্যের বাইরে আর কিছু খোঁজার প্রয়াস চালানোর ভিন্ন ইচ্ছে কোন হানা দিত না মনে।

হাসির পরেই আমি বলতাম, কিরে ভোদি কেমন আছিস? তারপর ঘরে ঢুকে যেতাম। আমাদের বাড়ীর গেইট খুললেই সামনে পড়ত ওদের বারান্দাটা।

ভোদি শব্দটা ওর কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ধরা দিত নাকি অভ্যেসের প্রয়োজন বোধে শুনত হাসি মুখে নাকি বিরাগভাজন ঘটাত ওর মনে সেটা তখনও জানা হয়নি। আসলে আমার দাদী আমার বড় বোন কে এই নামে ডাকতেন। সেখান থেকেই শেখা। শব্দটা দক্ষিনাঞ্চলে বেশী ব্যবহৃত হয় শুনেছি। কেমন একটা বোকা বোকা ভাব প্রকাশ পায় । হতে পারে ভোদাই এর স্ত্রী লিঙ্গ ভোদী। নাও পারে । আমার জানা ছিলনা।

ওর নামটাও কিন্তু সত্যি আমার তখন জানা ছিলনা। ভোদি বলতে বলতে ওই নামেই ও আমার কাছে পরিচিত। যদিও ওরা এ মহল্লায় বাড়ী কিনে উঠেছে , সেও তখন কম সময় পার হয়নি। বছর দেড়েক তো হবেই।

ওর নাম প্রকৃত নাম যে অনন্যা সেটা জানার সুযোগ হলো ঠিক বলা যাবেনা, জানতে বাধ্য হলাম যেদিন বিকেলে আমি ভার্সিটি থেকে ফিরতেই সেই পুরোনো অভ্যেসে যেই বলতে যাব , কিরে ভোদি ... মুখের কথা ও কেড়ে নিল , বলল, সাহির ভাইয়া আমার একটা নাম আছে , অনন্যা। আপনি আামাকে আর ঐ বাজে শব্দে ডাকবেন না। আমি বড় হয়েছি।

আমি শুধু এক গাল হাসি ঝেড়ে বলেছিলাম, ঠিক আছেরে ভোদী তাই হবে। কিন্তু ভোদী না বলার সাথে বড় হবার সম্পর্কটা ধরতে পারিনি। পেরেছিলাম পরের দিন।

আমি সেদিন সত্যি ভোদি বলে ডাকিনি। অনন্যা বলেই ডেকেছিলাম। জানলা দিয়ে ওহাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ভাইয়া প্লিজ পড়বেন।

ভাঁজ করা একটা ছোট কাগজ । ওর সামনেই কাগজ খুলতে গেলাম। ওমা! আমায় খুলতে দেখেই দিল ভোঁ দৌড়। চরম অবাক হয়েছিলাম। ওটা যে ছিল একটা

সদ্য যৌবন ছোঁয়া ছোঁয়া অঙ্গে মাতোয়ারা এবং রঙিন স্বপ্নে বিভোর বান্ধবীদলের পরিসরের আমেজ শোভিত এক কিশোরীর প্রেম পত্র ।

আমাকে লেখা-

'ভাইয়া আপনাকে আমি ভীষন ভালবাসি। আপনি কি ভালবাসেন আমাকে?'

পরদিন আর দাঁড়ায়নি। তারপরেও না। আমিই একদিন আমার ছোট ভাই , অনন্যারই বয়সী, সামিরকে দিয়ে ডাকিয়ে আনালাম। ও এসেছিল। যুগের হাওয়া। ভালবাসার ভ ও বোঝার বয়স হয়নি। প্রেম নিবেদন করতে শিখে গেছে। আমি না বোঝার ভান একটু করেইছিলাম। বলেছিলাম, ভাইয়াকে তো ভালবাসবেই। ওতো ভনিতার কি আছে তাতে। তার প্রতি উত্তরে ও যা বলেছিল তাতে আমার কথা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

আচ্ছা ওতটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে যদি বলে , ভাইয়া এ ভালবাসা সে ভালবাসা নয়। আমি আপনাকে চাই মনে প্রাণে, তখন আর বিমুঢ় না হয়ে উপায় থাকে।

সামলে নিয়ে বলেছিলাম, যাও বাসায় যাও । ভাল করে পড়াশুনা করো। এসব করার বয়স হয়নি এখনও।

কাজে লেগেছিল। আসলে বুঝে হোক আর না বুঝে হোক , ভাল সে সত্যি আমাকে বেসেছিল। পড়া শুনায় আগের চেয়ে তার অগ্রগতি সে কথাই প্রমান করেছে পরে আমার কাছে। এমনেতেই সে লেখেপড়ায় খুব একটা খারাপ ছিলনা। আমার সেই ধমক তাকে পড়ার প্রতি আরও বেশী উৎসাহ যুগিয়েছিল। সেটা সেই বলেছিল পড়ে যখন হয়েছিল আমার বউ।

বারান্দায় যে দাঁড়াত না, ঠিক তা না। তবে অভ্যেস করে নিয়মিতর সেই রূপটা ছিলনা। কথাও খুব একটা হতোনা। হলেও বড়জোড় আমি জিজ্ঞেস করতাম , পড়াশুনা কেমন হচ্ছে। প্রথম প্রথম উত্তর আসত জানিনা, পরে অবশ্য হেসে হেসেই বলত, এইতো ভাইয়া ভাল। কারন টা অবশ্য শুনেছিলাম। ওর মা কোন ব্যাপারে বেশ বকেছিলেন। আমার মার কাছেও এসেছিলেন অনন্যার মা। অবশ্য বেশী হৈ চৈ হয়নি। হতে দেননি দুই মহিলা, আমার আর ওর মা। সেটাই ভাল হয়েছিল। আমার পরীক্ষা চলছিল, অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল। হয়তো আমার পরীক্ষাও খারাপ হতো। জেনেছিলাম বছর দুয়েক পরে ও যখন টেনে উঠল। এতদিনে আর কোন অনভিপ্রেত ঘটনার অবতারনা সে করেনি। আমিও এত ব্যাস্ত থাকতাম ওর সাথে বলতে গেলে দেখাই হতোনা।

ওর বাবা একদিন ডেকে নিয়ে আমাকেই দ্বায়িত্ব দিলেন ওকে ম্যাথ আর ফিজিক্স পড়ানোর জন্য। পড়াতে গিয়েই জেনেছিলাম বাহুতে ব্লেড দিয়ে আমার নাম লিখতে গিয়ে মার কাছে ধরা খেয়েছিল। সেই দেড় বছর আগে হৈচৈ এর কারন ছিল

সেটাই। ও কিন্তু জানায়নি, ওর ছোট বোনটা মাঝে মাঝে বসত আমি পড়ানোর সময়। সেই একদিন ওর হাতে কাটা দাগটার উপর হাত দিয়ে বলছিল, আপু এটা কিরে? বাকীটা আমার জিজ্ঞাসায় ও বলতে বাধ্য হয়েছিল। বলতে বলতে খুব লজ্জা পাচ্ছিল। বলেছিল, সাহির ভাইয়া আপনার কাছে আমি পড়বোনা আর, আপনাকে দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকেনা। হয়তো আবার উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারি।

কত পরিবর্তন সেই সেভেনে পড়া মেয়েটার সাথে এই টেনে পড়া মেয়েটার। চেহারায় যেমন মার্জিত ভাব এসছে, ভাব এসেছে কথার ধরনেও। আমি পারিনি ওর কথা রাখতে। স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলাম। ওকে ভালবাসাটাই তখন মাথার মধ্যে ঘুরত। ও আর বলবে কি, আমিই বলেছিলাম, অনন্যা দু বছর আগে তুমি আমাকে যে কথাটি বলেছিলে আজ তার উত্তর দেব, শুনবে। ও মাথা নিচু করে অংক করছিল। আজকাল আমার দিকে মাথা উঁচু করে তাকায়না।

আমি ওর হাত টেনে ধরে লিখে দিয়েছিলাম তালুতে- *'ভালবাসি আমিও'*।

পরক্ষনেই মনে হয়েছিল ঠিক হয়নি। ওত আসলেই কত ছোট আমার থেকে। মাত্র টেনে পড়ে। আর আমি অনার্স পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি। ওর হাত পা কাঁপছিল। ভীষণ ঠান্ডা ছিল ওর হাতখানা। আমি ধরেই ছিলাম। মন ধমক দিয়ে বলেছিল আমায়, ভালতো বাসি, ওতো ভাবছিস কেনো। কিন্তু মন অন্যায় করেছিল অন্যভাবে, সাবধান করে দেয়নি। হাতটা ধরেই ছিলাম। অনন্যার মা দেখে ফেলেছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন, মেয়ের মাথার ভুত আবার সওয়ার হলো বলে। ট্রাজিক হিউম্যান লাইফ। এমনই হয়। না হলে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন ডেঙ্গু জ্বরে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগে। ডাক্তার আর হওয়া হলো না। ওই বাস্তবা মেনে নিয়েছিলাম। ভালবাসার বাস্তবতা কি নিজে তৈরী করা যায়না!

পরদিন আমার মা ডেকে বলেছিলেন, বাবা ও বাসায় আর পড়াতে যাওয়ার দরকার নেই। কেনো যেহেতু জানি, মার সাথে আর আর্গুমেন্টে গেলাম না তাই।

কষ্ট পাচ্ছিলাম। সত্যিই ওটা আমার প্রথম না হলেও একমাত্র প্রকৃত ভালবাসা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিলনা। খুব ভাবছিলাম কি করা যায়। কানে এসেছিল, অনন্যাকে এই বয়সেও ওর মা খুব মেরেছেন সেদিন। দোষ কিন্তু আমারই এবার। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। বন্ধুদেরকেও বলতে পারছিলাম না, ওরা হাসত, উপহাস করত। ওটুকুন একটা মেয়ের সাথে প্রেম, না কেউই সাপোর্ট দিতনা। সেটাইতো স্বাভাবিক। মন বলছিল ক্ষণে ক্ষণে , দূর প্রেমের আবার বয়স কিরে। প্রেম হলো অন্তরের মিল। বাহ্যিক মিল সেখানে অবান্তর। প্রেমে পড়লে বুঝি মনের কথাই বেদ বাক্য হয়ে ওঠে।

অবশেষে উপায় অনন্যাই দেখিয়েছিল। ওর ছোট বোন কে দিয়ে এক পৃষ্টার একখান পত্র পাঠিয়েছিল। যার সারমর্ম ছিল, ও আমাকে সেই ছোট বেলা থেকেই ভালবাসত, বাসে এবং বেসে যাবেই। তাই আমি হ্যাঁ না বললেও বাসত।

ওর ছোট বোনটা আমাদের দূত হয়ে গেলো। চিরকূটে চিরকূটে চলতে লাগল প্রেম। মাঝে মাঝে দেখাও হতো বাইরে। অল্প সময় দশ পাঁচ মিনিটের জন্যে।

এস এসসিতে রেজাল্ট করল খুবই ভাল। সবার কাছে ওর সামাদরের সাথে বিশ্বাসও বেড়ে গেলো। সাথে সাথে আমি উপলব্ধি করলাম বেড়ে গেলো ওর ক্রেজিনেস চরম ভাবে। আমিও তখন সদ্য একটা ফার্মে ছোট একটা জব শুরু করেছি। আর ওকে পায় কে। ওর এইচ এস সি পরীক্ষার কিছুদিন আগে বিয়েটা করেই ফেলতে হলো। সীমি নামের আমার এক বান্ধবী ছিল, সে আর তার হাসবেন্ড আমাকে খুব কেয়ার করত। চাকুরীটাও ওই ভাইয়াই জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তারা হেল্প করল। কোর্ট ম্যারেজ করেই ফেললাম চোখ মুখ বন্ধ করে।

দুদিন বাসায় আসিনি। তৃতীয় দিন এসেছিলাম। অবশ্য এর মধ্যে জানানোর ব্যবস্থা করেছিল সীমি আর তার হাসবেন্ড। বোঝানো সম্ভব হয়নি। কেস ঠিকই করেছিল অনন্যার মা বাবা। আর সার্টিফিকেটে ওর বয়স আঠারোর কমই ছিল। আমাকে হাজতে যেতেই হলো। আর ও ওদের বাসায়। বাবা জামিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু বাসায় উঠতে দেননি। বাবার রাগ ছিল খুব বেশী। মাও সাহস পাননি রাজী করাতে।

খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম। কোথায় যাই। সীমিদের কে আর ঝামেলায় ফেলাতে চাইছিলাম না। পুলিশি হয়রানিতে এমনেতেই জড়িয়েছে আমাদের কারনে । ট্রাজিডিই ঘটেছিল তখন আবার তবে সেটাই যেন চাইছিলাম। পারেনি আটকে রাখতে অনন্যাকে ওর বাবা মা। আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল শ্রেফ , তাতেই কাজ হয়ে গেলো। কেস উইতড্র করে নিলেন ওনারা।

ব্যাস , সীমিদের কাছ থেকে কিছু ধার কর্যকরে সেই রাতেই দুজনে চলে গেলাম কক্সবাজার। ফিরলাম পাঁচদিন পরে। এর মধ্যে সীমি একটা বাসা ঠিক করে ফেলেছিল। সেখানেই উঠলাম দুজন। রূপকথার শেষাংশে ও মতো দুজনে অবশেষে সেই এক রুমের ছোট্ট ঘরে বাস করতে শুরু করে দিলাম। আমি অফিসে যেতাম আর ও পড়ত। এইচ এস সিতে ওকে ভাল করতেই হবে। ওকে সব কাজ করতে বারণ করে দিয়েছিলাম। রান্না বানআ আমি আগেই পারতাম। সেটা কাজে লাগানো শুর করে দিলাম। কিন্তু এই একটা মানাতে পারলামই না। ও রানবেই। থাক , যে পড়তে পারে সে রাধতেও পারে। রাঁধুক।

পরীক্ষায় ভাল ফল এল সত্যি। এই সুযোগ প্রথমে আমার বাবা-মার কাছে গেলাম মিষ্টি নিয়ে, কিছু বললেন না তারা। আমিও বুঝলাম না, মৌনতা সম্মতির লক্ষন কিনা। অনেকক্ষণ নিরবতার পর বাবা অনন্যার মাথায় সত্যি হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেটা তিনি করতেন না কখনই, মৃত্যুও আগে মানুষ একটু নরম হয়, সম্ভবত উনি বুঝতে পেরেছিলেন ওনার সময় শেষ। আর অনন্যার বাবা মাতো ঢুকতেই দিলেন না আমাদের। কাজের লোক দিয়ে বিদেয় করেই দিলেন।

খুব কেঁদেছিল সারারাত সেদিন ও। সকালে সে কান্না থামলেও শুর হয়েছিল সত্যিকারের আরেক কান্না। বাবার মৃত্যুও খবরটা ভোরে পেতেই ছুটে গেলাম। কে জানত গতকালই ছিল শেষ দেখা। তবুও মনে সান্তনা শেষ দেখা টা তো হয়েছিল ওর পরীক্ষা পাশের অযুহাতে।

অনন্যার বাবা মা আসেননি। আসেননি বাবার মৃত্যুর পরে মার অগ্রাহ্য অনুরোধে যখন আমি আর অনন্যা মার এখানে আমাদের বাড়ীতে এসে উঠেছিলাম তখনও কোনদিন।

বাবার মৃত্যু আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। মৃত্যুই যেন সবচেয়ে বড় শিক্ষক। পুরো পরিবারের দ্বায়িত্ব অজান্তে কাঁধে চলে এলো। অবশ্য সেটার মাঝে আনন্দও আছে। অনন্যাকে বিয়ে করাটা আমার পরিচিত জন কেউই মেনে কেনো নিলনা আজও বুঝিনা। সেকি কেবলই দশ বছরের পার্থক্য বয়সের সে কারনেই। কি জানি। দশ বছর তো অতি সামান্যই। কত দেখলাম বিদেশ থেকে চল্লিশ বছরের ছেলেরা এসে ১৭ বছরের মেয়ে বিয়ে করছে। তখন কারও সমস্যা হয়না। বুঝলাম না। বন্ধু বান্ধবরা আজও খোটা দেয় নাবালিকা বিয়ে করেছি বলে। সেদিনতো এক বন্ধু বলেই ফেলল। তুই মরে গেলে এত সুন্দরী ভাবীটার কি হবে রে? ভাবখানা এমন যেন বয়স বিচারে মানুষ মরে।

ওদের আড্ডা টাড্ডায় আজকাল আর যেতেই ইচ্ছে করে না। আর সময়ই কই। বাবার ব্যবসাটা দেখা শুরু করতেই হলো মার পীড়াপীড়িতে। চাকুরীটা ছেড়ে দিতে হলো। অনন্যার উপরও মা খুব খুশী। ও এই বয়সেও ভীষন সংসারী, গোছানো।

মেডিক্যালে ভর্তি হতে পারত । আমি এত বুঝলাম, হলোই না। বলল, ঢাকায় হলেহতাম। ময়মনসিংে যাবেনা। কি আর করা । ঢাকা ভার্সিটিতে মাইক্রোবায়োলজিতে ভর্তি হয়েছিল। লেখাপড়া ঘর সব ও সামলাচ্ছিল। ভালবাসলে মেয়েরা সবই পারে, ওকে দেখেই সেটা বোঝা যায়। আরও বোঝা যায় ওদের বাসার দিকে তাকিয়ে যখন কাঁদে রাতে নিরবে, তখন ওর কোমল হৃদয়ের প্রকৃত রূপ। ওর ছোট বোনটা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝে আসত। লুকিয়ে বলা ঠিক হবে না। আমি নিজে দেখেছি ওর বাবা একদিন দেখে ফেলেও না দেখার ভান করেছেন। হাজার হোক মেয়েতো।

মার খুব ইচ্ছে ছিল আমার সন্তান দেখে যাবেন। ইচ্ছে পূরণ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উপর ওয়ালার ইচ্ছে না থাকলে কি আর হবে। মা তো চলেই চলেই গেলেন আমাদের ছেড়ে। ছোট ভাইটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বিদেশে পড়তে। এত বড় বাড়ীতে আবার আমরা সেই দুজন কেবল।

ওর ছোট বোনটার বিয়ে দিয়েছিল ইন্টারে পড়ার সময়। ওকে নিয়ে অনন্যার মতো রিস্কে পড়তে চাননি ওনারা। দাওয়াত দিয়েছিলেন আমাদের । এই প্রথম জীবনে। যাওয়ার উপায় ছিলনা। ইচ্ছে তো পড়ের কথা। সবে অনার্স ফাইনাল দিয়েছিল

অনন্যা। একই সাথে ও কনসিভ ও করেছে। যেদিন ওর ছোট বোনের বিয়ে ছিল সেদিনই ওকে নিয়ে ছুটতে হলো হাসপাতালে।

এই প্রথম রাগ হলো ওর বাবা-মার প্রতি আমার। এলেন না আমাদের ছেলেকে দেখতে । অনন্যার ছোট বোন অবশ্য তার হাসবেন্ডকে নিয়ে বিয়ের আসর থেকে বিদায়ের পর এসেছিল। খুব ভাল ছেলেটা। ইঞ্জিনিয়ার। পণ করতে ইচ্ছে করল, এরপর আর কখনও সম্পর্ক নরম্যাল হতেই পারেনা। হতে দেবনা। অনন্যা মানা করল। হাজার হোক বাবা মা তো।

ওকে চাকুরী করতে বলেছিলাম। বলেছিলাম তোমার এত মেধা, কাজে লাগানো উচিৎ। রাজী হলো না। বলল, ঘর সংসারে কাজে লাগাবো, সমস্যা কি। অবশ্য আমার ব্যবসা খুব ভাল চলছিল।

কিন্তু ভাল চলছিলনা অনন্যার দেহটা। ধরা পড়েনি কেনো বা কি হয়েছিল ওসব বলে লাভ নেই। মৃত্যু ওকে পছন্দ করে ফেলেছিল। কে বাধবে মৃত্যুকে, কে? ক্যান্সারে আমার অনন্যা মরেই গেলো আমাকে আর আমাদের তিনবছরের ছেলেটাকে একা ফেলে রেখে।

কোথায় আমার সেই মুর্খ বন্ধুর দল, বলেছিল, আমি চলে গেলে ওর কি হবে? মৃত্যু ,মানবীয় নিয়ম মানে নারে। ওর নিয়ম ওর নিজের কাছেই। কেউ জানেনা।

বাবা গেলেন, মা গেলেন, শেষে প্রিয়তমা বউটিও। আর অনন্যার বাবা মা আমাদের থেকে দূরে রয়ে গেলেন, রয়ে গেলেন মৃত্যু থেকেও। বাচ্চাটাকে নিতে এসেছিলেন। বোঝাচ্ছিলেন, কিভাবে মানুষ করব। আরকেটা বিয়ে করার কথা বলছিলেন। বয়স আর কতই হলো আমার। আমি শুনে হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে এতবছর পরে সম্পর্কটা নরম্যাল হলো সেটা বুঝতে পারছিলাম। ওনারা নিয়মিত আমার খোঁজখবর নেন এখন।

ভাবছি, প্রতিটা মৃত্যু কত কিছু দিয়ে যায়।

ছেলেটাকে অনন্যার ছোট বোন মানুষ করতে শুরু করেছিল। আমি বিয়ে করবনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। আজকাল ভীষণ একা লাগে। সীমি আর ওর হাসবেন্ড দেশ ত্যাগ করেছে বছর দুয়েক হলো। মাঝে মাঝে ফোন করে অবশ্য।

মন খারাপ হলেই ছেলেটাকে নিয়ে আসি । সারাদিন ওকে ঘুরে বেড়াই। ও এখন ভালই হাঁটতে পারে। ছেলের খালা তাকে একটা বেশ নাম দিয়েছিল জন্মের পরে, সাহিল। ওটাই চলছে।

ইদানিং একটা নতুন চিন্তা ঢুকেছে মাথায় । মৃত্যু চিন্তা। যদি মরে যাই। আমার সাহিলের কি হবে। সাহির আর অনন্যার জন্য একদা যারা ছিল অন্তপ্রাণ, তাদের কেউই যে আর থাকছেনা। থাকছে তারাই যারা দিয়েছে নিখাদ কষ্ট। আসলে এইই হয়। প্রতিটা মৃত্যুই কত কিছু বদলে দেয়। তথাপি মৃত্যু আসবেই। বদলে যাবে কত কিছুই।

ছোট ছোট বৃত্তের পরিধি

অনেকদিন পরে, মনে ভাবনার রেণুগুলো যেন পাখা ফিরে পেয়েছে, উড়ছে শরতের হালকা বাতাসে, ঠিক সেই আগের মত।

যেদিন এখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম শেষ বিদায় পূর্ণ করে, সরু পথটার মাঝামাঝি যেতেই পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলাম একবার, নিঃস্ব ফেলে আসা বিছানাটার মলিন মুখ মনে কষ্টের ঢেউ বইয়ে দিয়েছিল। উপস্থিত মেসের সহবাসিন্দা দু'জন সহজাত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছিল। সরু গলিটার উপরে আকাশের যে চিলতে অংশটুকু নজরে আসছিল সেখানে সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ শরতের মেঘ উড়ে যাচ্ছিল আমার নবযাত্রার পানে অভিনন্দন এর হাস্য ঝিলিক ছড়িয়ে।

বিছানাটা আজও খালি, মলিন আজও তার মুখ খানি যেন। শুনলাম , নতুন যে ছেলেটি এসেছিল আমার সিটে , সে চলে গেছে গতকাল। হয়তো গেছে আমারই মত কোন উচ্চাভিলাষ মোহে অথবা ঠিক আমার মতই নয়, হতে পারে কোন ভিন্ন সুরের উচ্চতর জীবনাধ্যায়ে। কিন্তু অচেনা বন্ধু, ফিরে আসতে হয়, এই তো জীবন-ছোট ছোট বৃত্তের পরিধি।

লাফ দিয়ে বসতেই বিছানাটা কচকচ করে যেন স্বাগতম জানালো , চিনল, পুরাতন মনিবকে।

এই জীর্ণ মেসটা ছেড়ে যেদিন পূর্ণ বিদায় নিয়ে চলে গেলাম , বিয়েটা হয়েছিল তার তিন দিন আগেই, ২৮ শে আগষ্ট , ২০০৬ তারিখে। বিয়ে হয়েছিল রুমকীদের বাসাতেই। আমার পক্ষের লোক বলতে কেবল তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার। বাবা-মা তো বিয়ের আগের রাতেই মোবাইলে ফাইনাল কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'এই মেয়েকে বিয়ে করলে বাড়ী আসা বন্ধ।' সকল হিসেব নিকেষ আর ভালবাসার সূতো ততক্ষণে এত শক্ত হয়ে উঠেছিল যে বাব মার সে প্রত্যক্ষ হুমকিতে কোন ভাবান্তরই হলো না আমার।

বিয়ের ঐ দিনটির সাত আট মাস আগে শুরু হয়েছিল রুমকীর সাথে পরিচয় পর্বটা। বিয়ের দিন ভেবেছিলাম, পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে, পরিচয় পেয়েছে পূর্ণতা। কিন্তু আজ বুঝছি, পরিচয় এর প্রথম পরিচ্ছেদটাই আমার পাঠ করা শেষ হয়নি।

সেই সাত আট মাস আগে একদিন ঈষানের সাথে যেতে হয়েছিল বনানীতে এক পশ রেস্তোরায়। ঈষান আমার তখনকার দিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। রেস্তোয়ার

যাবার মুখ্য কারন ছিল ওর প্রেমিকার (নামটা মনে পড়ছেনা এই মুহূর্তে) সাথে দেখা করা । সেখানেই রুমকী এসেছিল, ঈষানের প্রেমিকার বান্ধবী সে। তারপর ফোন নম্বর বিনিময়, কথা আর প্রেম। আমার তো মনে তখন বুয়েটে পড়ার অদম্য ভাব আর রুমকীর মনে ধনী কন্যার অচিন্তনীয় আবেগ। সেই পুরাতন প্রেম এর গল্প। ইতিমধ্যে ঈষান আর তার প্রেমিকা বিয়ে করে পাড়ি জমিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়া। ধনীর কন্যার তারপর থেকেই বিয়ের ইচ্ছা প্রবল হতে থাকে। সেই ঘোরের কালে একদিন তাই হঠাৎ জানতে বাধ্য হলাম ওর বাবা বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ এবং একই সাথে টপরেটেড শিল্পপতিও। ইনডিসিশন এ পড়ে গিয়েছিলাম। পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল আমার মতো একজন সামান্য ইস্কুল মাষ্টারের ছেলের , একজন নব্য ইঞ্জিনিয়ারের। কিন্তু সেটাই তো কাল, গুণের বদৌলতে না হয় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই ফেলেছি তখন সদ্য, কিন্তু চাকুরীরর জন্য ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে শুরু করেছিলাম গুনটাই কোন কংক্রিট যোগ্যতা নয় চাকুরীর জগতে। এখানে বিরাজ করে আরও অনেক হিডেন রহস্য। সম্বল ছিল কেবল দুটো বেশ রিষ্ট পুষ্ঠ টিউশনি।

হিসেব নিকেষ শুরু হয়ে গেলো গণিতে ফুটন্ত মস্তিষ্ক। লোভ, লালসা আর মোহাচ্ছন্ন এক ভালবাসা মিলিয়ে সুন্দর একটা সমীকরণ বানাতে তাই কষ্টই হয়নি।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শ্বশুর মশাই ও যখন কোন অমত করলেন না এই বেকার ইঞ্জিনিয়ারটিকে তার জামাই হিসেবে মেনে নিতে তখন আর পিছুপা হবার ভাবনাই কেনো জাগবে? একটা চিন্তা এসেছিল, ভেবেছিলাম ক্ষণিক, কিন্তু মনে হয়েছিল, বিয়ে নামক সাধারণ একটা বিষয় ঐ উন্নত(!) সমাজ আর সম্রাজ্যে অমত করার মত ক্ষীণ মানসিকতার ফাঁদ থেকে অনেকটাই যেন মুক্ত।

এর উল্টো ধারনাও যে সত্যি হতে পারে সেদিন কি আর তা ভাবলে বাবা মা কে ভুলে দৌড়াতে দৌড়াতে বর সেজে বসি?

আসলে শ্বশুর মশাইয়ের একটিই ছেলে, দেশের বাইরে পড়ছে আর অন্য মেয়েটি মানে আমার শ্যলিকা টি স্কুলে, স্ট্যান্ডার্ড সেভেনে পড়ে সবে। এত ঐশ্বর্যের পাহাড় , ব্যবসা পাহারাদিতে ঘরজামাই হিসেবে সদ্য পাশ ইঞ্জিনিয়ার হয়তো তাই তাদের জন্য ভালোই হলো। গড়ে পিঠে নেবে ভেবে থাকতে পারে। আমিও বুঝে না বুঝেই ছাল চামড়া ছাড়িয়ে সে গড়ন পিঠনের শিক্ষায় বুক পেতে দিলাম।

রুমকীর ভালবাসার কমতি ছিলনা। দেহ মনে জুড়ে প্রচন্ড সুখ। চেনা জানা বন্ধুরা যেখানে সবে ফ্রেশার হিসেবে বড় কোন কোম্পানী জব পেতে শুরু করেছে তখন আমি নিজেকে দুই তিনটে কোম্পানীর ছোট খাট কর্ণধার ভেবে আকাশে উড়ছি। সুখপাখী তো নিঃসন্দেহে মম মনে বাসা বাধতেই চাইবে। বাবা মা মেনে না নিলেও , যখন বাড়ীতে গেলাম একদিন বুঝলাম আমার সে সুখের আবেশ তাদেরও নিরবে কম আবেশিত করেনি। জগতটাই স্বার্থপর। ওনারা নিরব সম্মতি জ্ঞাপন করে পুনরায় বাড়িতে আসতে বললেন সময় পেলে।

মন উচাটনে পড়তে শুরু করেছিল, যখন সেই অল্প অভিজ্ঞতায় অনেক উপর থেকে ব্যবসা আর দেশিয় নানা সিস্টেমে অবর্ণনীয় দূর্ণিতী চোখে পড়তে লাগল, সদ্য ছাত্রজীবন কাটানো সম্ভাবনায় প্রফুল্ল মন মেনে নিতে লাগল সে সব। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে নিল , এতো ঢেড় ভাল, অন্তত অন্য কোন জবে প্রেষনে উর্ধ্বচাপে পড়ে কোন অন্যায় করতে হচ্ছেনা। খালি দেখতে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। ব্যস্ততা তো বাড়ছিলই দ্রুত, ২০০৬ এর শীতকাল , দেশের রাজনীতিতে ভীষণ অস্থিরতা। শ্বশুর মশাই ব্যবসার চেয়ে রাজনীতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। নিজেকে অনেক বড় কিছুমনে হচ্ছিল ব্যস্ততার মাঝে ক্ষমতায়নের ব্যাপকতায়। রুমকীও বড়লোকী চাল বাড়াতে শুরু করেছিল। সুখে থাকলে ভূতে কিলায় আর কি। কদিন পর পর বিদেশে শপিং , নতুন ছেলে বন্ধু। কিন্তু ভালবাসার কমতি ছিলনা।

অবশেষে এল সেই ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী। দেশের রাজনীতিতে অভাবনীয় রূপান্তর।

দূর্ণিতী মুক্ত করার এক মহান ব্রত নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন অন্তর্বর্তীকালীন এক সরকার। অবাক হলাম শ্বশূর মশাইয়ের ব্যবসাতেও মন্থরতা চলে এল। প্রথমে ভাবলাম, একি আমার মত অনভিজ্ঞর ভুলে। কিন্তু পরে বুঝতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি আসলে কোন নিয়ামকই না, কর্মীই মাত্র। দেশের পরিবর্তীত বাতাসের সাথেই ব্যবসার ধরন ধারন, জ্যামিতিক হারের প্রোফিট সব ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে যখন শুনছিলাম দূর্ণিতীবাজদের লিস্ট হচ্ছে। শ্বশূর মশাই খুব টেন্সড থাকতে লাগলেন। প্রথম লটেই ওনার নাম চলে এল পত্রিকার পাতায়।

মাত্র এক মাসের মধ্যেই গ্রেফতারি পরওয়ানাও। কিন্তু অবাক হলাম যখন শ্বশুর মশাইয়ের সাথে নিজেকেও খুঁজে পেলাম জেল খানায়। সেই প্রথম জেলখানার সাধ পাওয়া হলো। যাক তবুও ভিআইপির জামাই হিসেবে অর্ধ ভিআইপি সম্মান পেলাম। কোন কিছু না বলেই অবশ্য পরের দিন ছেড়ে দিয়েছিল। আসার সশয় শ্বশূর মশাই বলে দিয়েছিলেন সবাইকে দেখতে। জেল থেকে বের হয়ে পত্রিকার পাতায চোখ বুলিয়েই দেখলাম রুমকী আর ওর মার নামেও কেস করতে চাইছে সরকার । ওদের ব্যাংক একাউন্টেও বিপুল অংকের অর্থ পাওয়া গেছে, যার কোন ট্যাক্স দেয়া হয়নাই। রুমকীকে একদিন পরেই ছাড়ানো গিয়েছিল, কিন্তু শ্বাশূড়ীর কেস পোক্ত ছিল বেশ।

ও বাড়ীতে তখন আমি আর রুমকীই প্রধান কর্তা। খুব মন মেজাজ খারাপ থাকত। কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম ভেবে অস্থির হতাম। বাবাও একদিন ফোন করে খবর নিয়েছিলেন কেমন আছি। হতে পারে সেটার ও একটা এফেক্ট ছিল।

রুমকীর সাথে প্রায়ই ঝগড়া হতো। যদিও রুমকীর মন বিষন্ন জেনেও আমি প্রায়ই নিজের রাগ ঝাড়তে লাগলাম ওর উপর। শ্বশূর শ্বাশূরী উভয়ের নামে পত্রিকার পাতায় নিয়মিত দূর্ণিতীর ফিরিস্তি পরতাম আর রুমকীর কাছ বিষোদগাড়ন করতাম। ওকম

যাবে কেনো? কদিন বা আমার সে সব পট পাল্টানো কথা শুনবে। আমাকেও শুনাতে লাগল কথা, খোটা দিতে লাগল দারিদ্রের। বলতে লাগল বানিয়ে বা হয়তো জেনেই অন্ত র্বর্তীকালীন সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নামে কুৎসা।

এরই মধ্যে একদিন দেখলাম সেই অন্তর্বর্তীকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন বিশিষ্ট উপদেষ্টা আবার পদত্যাগও করলেন। অবাক হলাম। তবে কি রুমকী যা বলত...। দূর, তা হবে কেনো, আমি নিজেই তো কত স্বাক্ষী শ্বশূর মশাইয়ের কৃতকর্মের।

সম্পর্কটা ধীরে ধীরে তিক্ততার মধ্যে চলে যাচ্ছিল, আমারও ব্যবসা দেখতে ভাল লাগছিলনা। কিন্তু শ্বশূর মশাইকে কথা দিয়ে এসেছিলাম। যাক এর মধ্যে রুমকীর মার কেসটা মিটআপ হয়ে গেলো হঠাৎ একদিন । মোটামুটি একটু ঠান্ডা পরিবেশ ঘরে, উনি ফিরে আসায়। খুব নামায কালাম পড়তে লাগলেন শ্বাশূড়ী।

কিন্তু বেশীদিন না, ঝগড়া টা এবার আরও বাড়লই, বিছানাটাও পৃথক হলো। হবেই না কেনো। শ্বশূর মশাইয়ের জামিনের ব্যাপারে আমাকে কিছু কাজ দিয়েছিলেন ওনাদের উকিল, আমি করতে সম্মত হয়নি। আমি তখনও জানতাম এত যার নামে দূর্ণাম আর কেস তার শাস্তি হবেই। জামিন তো পাবেই না। রুমকী রেগে আগুন হলো। আমাকে আর বললই না কিছু। সে নিজেই উকিলের সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করল।

অবশেষে অবাক হলাম, হঠাৎ একদিন রাজনীতির পটে আবার নতুন মেঘ, নতুন শরতের শুরুতেই একে একে জামিন পেতে শুরু করল সব বড় বড় দূর্নিতীবাজ নামে আখ্যায়িত ভিআইপি গণ।

শ্বশুর মশাইইবা আর বাদ যাবেন কেনো। তিনিও ভীষণ প্রতাপশালী ছিলেন। যেদনি জানলাম উনি আগামীকাল ছাড়া পাচ্ছেন জামিনে, আমিও খুশি হলাম অজান্তে। তোড়জোড় এ লেগে গেলাম স্বাগত জানানোর জন্য। কিন্তু আগের রাতে চড়াও হলো রুমকী। ভীষণ ক্ষিপ্ত। আমাকে চলে আসতেই হলো। যে লোকটির নামে আমি এত বদনাম করেছি, যার বিরুদ্ধ কথা বলে রুমকীর সাথে ভালবাসার বন্ধন শিথিল করেছি তার আগমনের আগেই রুমকী চাইল আমি যেন বিদেয় হই। না হলে ওই চলে যাবে। তাই কি হয়। ওযে ভীষণ জেদি। আচ্ছা আমার কি দোষ, পত্রিকার পাতায় এত পড়ছিলাম, নিজে ও তো জানতাম অনেকটা। কিন্তু বাস্তবতা সেটাই যেটা বাস্তবে ঘটে, ভুলে যাচ্ছিলাম।

সকালে গোপনে গৃহ ত্যাগ করে ফিরে আসি পুরাতন মেসে। লজ্জায় না ক্ষোভে তা জানিনা। কিন্তু ফিরেতো আসি বহুদিন পরের আরেক শরতের সকালে।

...ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে এসেছিল। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠতেই সম্বিত ফিরে পেলাম। শ্বশূর মশাইয়ের নম্বর। চলে এসেছেন তাহলে বাসায়।

'বাবাজী ব্যবসাটা যখন সুন্দর বুঝে নিতে লাগলে, ভাবলাম - ভেবে শান্তি পেলাম এই ভেবে যে অর্ধেক মনের মত একটা জামাই পাওয়া গেছে। আর আজ জেনেছি অর্ধেক না পুরাপুরি মনের মত জামাই পেয়েছি। তুমি আর দেরি করনা বাবাজী এক্ষুনি চলে এস, নির্বাচন করতে হবে না? তুমিই পারবে, তোমাকেই পাশে প্রয়োজন বাবা, তোমাকেই প্রয়োজন।'

কিন্তু বাবা, রুমকী!

'আরে দেখ, বলতেই ভুলে গেছি, ওতো তোমাকে ফেরাতেই রওয়ানা দিয়েছে। বাবাজী, জীবন হলো - জান তো, ছোট ছোট বৃত্তের পরিধি। জোড়া দিয়ে দিয়েই সেটাকে বৃহত্তর বৃত্তে পরিণত করতে হয়।'